আখতার হোসেন : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা পৃষ্ঠা ২

স্থিতাবস্থা বনাম উন্মত্ত ১৩ দফা, এক নব্বই-ঊর্ধ্ব ধর্মগুরু এবং ক্রুদ্ধ যুবকেরা পৃষ্ঠা ৩

শাহবাগ আন্দোলনের রেশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে পৃষ্ঠা ৫

এখনও বিষের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়নি, তুমি কথা বলো পৃষ্ঠা ৭

নাস্তিকরাই কেন বার বার পৃষ্ঠা ১২

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির রাজনীতি পৃষ্ঠা ১৩

গ্রেফতার হওয়ার আগে গোলাম আযমের বক্তব্য পৃষ্ঠা ১৬

বাংলাদেশের ব্লগারদের খোলা উঠোন পৃষ্ঠা ২১

একটি শ্রমজীবী শিক্ষাভাবনা পৃষ্ঠা ২৬

মেমারিতে আলুচাষের অভিজ্ঞতা পৃষ্ঠা ২৭

চিঠিপত্র : পৃষ্ঠা ৩০-৩১
১ বিষয় : সম্পাদকীয়
২ বিষয় : সম্পাদকীয়

মন্থন সাময়িকী : ২০১২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব পৃষ্ঠা ৩২

মার্চ-এপ্রিল ২০১৩ ❐ চতুর্দশ বর্ষ ❐ দ্বিতীয় সংখ্যা ❐ ১০ টাকা

মন্থন সাময়িকী

আমাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

এক সাহিত্যসভায় একজন বন্ধু সেদিন বললেন, 'সাপ গর্তের ভিতর থাকাই ভালো'। প্রসঙ্গটা ছিল বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন। কথাটা অর্থবহ এবং একটা স্পষ্ট মতও বটে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপরের প্রতি যে বিদ্বেষ-বিষ থাকে, তা মনের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকাই ভালো, তাকে টানাটানি করে বাইরে নিয়ে আসা বিপদের। কিন্তু আমাদের কোনো রিপু বা প্রবৃত্তিকে কি চিরতরে মনের গহনে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়? ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ইত্যাদি বোধের পাশাপাশি ঘৃণা, প্রতিযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, শত্রুতা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতার বোধ আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা কি ইচ্ছা করলেই সেগুলোর কোনোটাকে চিরতরে দমিয়ে রাখতে পারি? পারি না।

বরং আমরা সেগুলো সম্বন্ধ সজাগ থাকতে পারি, সমাজের পাঁচজনের মধ্যে মেলামেশার মাধ্যমে সেগুলোকে খোলাখুলি মোকাবিলা করতে পারি, ভালোমন্দের বিচার করে আমাদের রিপুগুলোকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারি।

সাপ সারাবছর গর্তের মধ্যে কখনোই থাকতে পারে না। তাকে জীবনের তাগিদেই বাইরে আসতে হয়। তবে সাপ মানেই দংশন নয়। সাপ মানেই অকারণে মানুষের ক্ষতি করা নয়। আমাদের প্রকৃতিজগতের মধ্যে তাকে ঠিক মতো চিনতে পারলে আমরা বরং অকারণ বিপদ থেকে খানিকটা রক্ষাও পেতে পারি।

এখানেই আসে সহাবস্থানের প্রসঙ্গ। প্রকৃতিতে এক ধরনের সহাবস্থান আমরা দেখতে পাই। সমাজে সহাবস্থানের কথা ভাবতে পারলে আমাদের ভিতরকার বিদ্বেষী মনটাকে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করতে পারি। সমাজই আমাদের এই সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছে।

এবারের সংখ্যায় শাহবাগ আন্দোলন এসেছে নানান বিপরীতমুখী ভাবনার সহাবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে।

আখতার হোসেন : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

মোজাম্মেল হক

আখতার সাহেব সম্পর্কে কিছু লিখতে বসে এত পুরোনো কথা, পুরোনো স্মৃতি মনে ভিড় করছে — কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি — ঠিক করাই সমস্যার, মুশকিলের। ১৯৬২ সালের চীন–ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৪ সালের ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় বাধ্য হয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের মেসবাড়ি ছেড়ে প্রথমে গার্ডেনরীচের ফতেপুর ভিলেজ রোড (হরিমোহন ঘোষ কলেজের পিছনে), পরে রাজাবাগান ডকইয়ার্ডের সামনে এবং শেষে বটতলার কানখুলি রোডে কোরবান থান্দারের গ্যারেজে (সিকসেন কোম্পানি) আমার থাকার ব্যবস্থা। তখন স্থানটা ওই নামেই পরিচিত ছিল।

'কোরবান আলি অ্যান্ড সন্স' নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তখন ভারতীয় রেলের কর্মচারীদের এবং ভারতীয় সৈন্যদের পোশাক তৈরি হত। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের পোশাক তৈরির কনট্রাক্টর ছিল। এলাকায় একে টেন্ডারি কাজ বলা হত। ডব্লু–২২ কানখুলি রোডে ওই সংস্থার অফিসে থাকা হত আমার। কোরবান থান্দারের বাড়িতে ছেলে পড়াতাম। সকালে ছেলে পড়ানো আর সন্ধ্যায় খবরের কাগজে কাজ।

কোরবান থান্দাররা তৎকালীন সময়ে এলাকার অন্যতম ধনী লোক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় আখতার সাহেব ছিলেন কোরবান থান্দারের ভাগনা এবং একমাত্র জামাই। কানখুলি রোডের গাবতলায় পৈতৃক বাড়ি হলেও আখতার সাহেব মামাবাড়িতে বড়ো হন এবং লেখাপড়া শেখেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে তিনি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ইউনিভার্সিটিতে এমএসসি–তে ভরতি হন। এমএসসি কমপ্লিট না করে দু–বছরের মাথায় তিনি ফিরে আসেন।

থান্দারদের ওখানে থাকতে থাকতে আখতার স্যারের সাথে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ছিলেন আমার ছাত্রছাত্রীদের 'মেজোবাবা'। দুজনেরই বামপন্থী মানসিকতা ও বামপন্থায় বিশ্বাস থাকায় আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর ও দৃঢ় হয়। আখতার সাহেব খুব শৌখিন ছিলেন। বেশিরভাগ সময় কোট–প্যান্টে স্বচ্ছন্দ থাকতেন। খুব দামি জিনিস কেনার প্রবণতা ছিল তাঁর। স্যারের ভাষায় — টপ্ চা, টপ্ সিগারেট টপ্ পেন, টপ্ জুতো ইত্যাদি কেনার খুব শখ ছিল। কলেজ স্ট্রীটে সুবোধের চায়ের দোকান, ওখানকার দিলখুসা রেস্টুরেন্টের পাশে কলমের দোকান, মেট্রো গলির সিগারেটের দোকান, গ্র্যান্ড হোটেলের নিচের জুতোর দোকান থেকে কখনো কখনো দুজনে একসঙ্গে গিয়ে কেনা হয়েছে। আবার অনেক সময় আমাকে ওঁর জন্য এনে দিতে হয়েছে।

ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়টা আখতার স্যারের জীবনে একটা গৌরবময় সময় — একটা টার্নিং পয়েন্ট। আখতার সাহেব তখন এলাকায়, বিশেষ করে দর্জি এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য হাজী নূরুল হক মালী, বি এ রওশন আলি, কাসেম থান্দার, সোয়েব মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বটতলা এলাকায় মেয়েদের জন্য হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত। সঙ্গে ছিলেন সেই সময় লাইব্রেরিতে বসাওঠা করা এলাকার বহু যুবকবৃন্দ, মুরুব্বীগণ ও শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষ। সেই সময় স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন। যে কোনো মূল্যে গার্লস স্কুল করতে হবে এই ব্রতে যেন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সবাইকে চেনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আখতার স্যারের মাধ্যমে কয়েকজনকে চিনতাম।

বটতলা মোসলেম লাইব্রেরি এই এলাকার শিক্ষা–সংস্কৃতির পীঠস্থান। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এলাকার লেখাপড়া জানা ছেলেদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আলাপ–আলোচনার মাধ্যমেই এলাকার মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে একটা গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই সময় এই কাজ অত সহজ হয়নি। রাজনৈতিক–সামাজিক অনেক প্রতিবন্ধকতা, নানাপ্রকার সংস্কার ও বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বটতলা গার্লস হাই স্কুল। প্রথমে এই স্কুল শুরু হয় বটতলা মাদ্রাসায়। পরে বর্তমান ঠিকানায় (লাইব্রেরির পাশে) স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। আখতার সাহেব ছিলেন ওই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

এর দশ বছর পরে ১৯৭৬ সালে বটতলা গার্লস হাই স্কুল বিল্ডিংয়ে গার্লস স্কুলের অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে ছেলেদের হাই স্কুল। এখানেও আখতার সাহেব ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। তিনি বটতলা মাধ্যমিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। বটতলা দর্জি এলাকার শিক্ষা–সংস্কৃতির আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে গেলে আখতার সাহেবের ভূমিকা ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

স্যারের স্বপ্ন ছিল এই এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার। দর্জি সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং দর্জিশিল্পের বিকাশের জন্য টেকনিকাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও তিনি চালিয়ে গেছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে দর্জি সমাজের উন্নতিকল্পে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানাতে বলেন।

আখতার সাহেব প্রচণ্ড পড়াশুনা করতেন। লেখালেখিও করতেন সবসময়। স্যারের বহু লেখা আমাকে অনুলিখন ও পুনর্লিখন করে প্রেসে দিতে হয়েছে। স্যারের হাতের লেখা পড়তে পড়তে বহু অজানা বিষয় ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছি। এজন্য আমি গর্বিত এবং স্যারের কাছে ঋণী। মার্ক্সবাদের ওপর তাঁর প্রচণ্ড দখল ও জ্ঞানের গভীরতা ছিল। বটতলা লাইব্রেরিকে পরিপূর্ণ রূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের বহু কেনা বই লাইব্রেরিকে দিয়েছেন এবং বহু বই লাইব্রেরির মাধ্যমে কিনিয়েছেন। বহু রেয়ার কালেকশনে বটতলা মোসলেম লাইব্রেরি স্যারের প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, কোনো নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কোনো বাধাধরা চাকরির বেড়াজালে তিনি নিজেকে জড়াতে চাননি। জীবনে দু–দুবার সরকারি চাকরির সুযোগ এসেছিল। মরহুম ইয়াসিন গাজী যখন গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারির পদ থেকে অবসর নেন, তখন ওই পদে যোগ দেওয়ার জন্য তৎকালীন পৌর কর্তৃপক্ষ ওঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উনি তা গ্রহণ করেননি। ... *পরবর্তী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

স্থিতাবস্থা বনাম উন্মত্ত ১৩ দফা, এক নব্বই–ঊর্ধ্ব ধর্মগুরু এবং ক্রুদ্ধ যুবকেরা

রুমি চৌধুরি

৬ এপ্রিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে ১৩ দফা দাবিতে হেফাজতে ইসলামের একটি জমায়েত হয়। অসমর্থিত সূত্রের খবর, সেখানে সাত লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিল। আওয়ামিপন্থীরা প্রচার করেছিল যে হেফাজতে ইসলাম আসলে জামাতে ইসলামিরই একটা রূপ। প্রশ্ন ওঠে, হেফাজতে ইসলাম তো কওমি মাদ্রাসাগুলির একটি মোর্চা এবং তারা দেওবান্দিদের দ্বারা পরিচালিত। দেওবান্দিরা জামাত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠাতা মওদূদীকে মোটেই পছন্দ করে না। হেফাজতে ইসলাম এবং জামাতকে এক বলে দেওয়া ঠিক কি?

যুবসমাজের ভিতর থেকে ঝলসে ওঠা শাহবাগ আন্দোলনের এক আবেগঘন মুহূর্তে এবং সমাজের অভ্যন্তরেই অন্য এক প্রান্তে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার পরমুহূর্তে রুমি চৌধুরির এই লেখাটি (পোস্ট) ইংরেজিতে 'আলাল ও দুলাল' ব্লগে প্রকাশিত হয়। লেখাটি নিয়ে অনেকেই ব্লগে মন্তব্য করতে শুরু করে। 'স্থিতাবস্থা' শব্দটিও অনেককে বিচলিত করে তোলে। জবাবে রুমি চৌধুরি লেখেন, 'কে বলে যে স্থিতাবস্থা মানে ১৮৯৬ সালে যা ছিল সেই অবস্থায় স্থিত থাকা? জোবরা গ্রাম, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের যেখানে জন্ম, সেটা তো এই মাদ্রাসার দশ মাইলের মধ্যেই। ১৮৯৬ থেকে দেশ অনেক পাল্টেছে এবং একইরকম ভাবে পাল্টেছে আমাদের স্থিতাবস্থা। স্থিতাবস্থা হল এক ধীরগতি ধৈর্য্যশীল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কোনো চটজলদি চেষ্টা মানেই মাত্রাছাড়া সক্রিয়তা। এই পোস্ট লেখার উদ্দেশ্য হল হালফিল ঝলক–মুহূর্ত এবং তার আনুমানিক ক্ষণস্থায়ী জীবৎকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা।' লেখাটি বঙ্গানুবাদ করেছেন জিতেন নন্দী।

হেফাজতে ইসলামের লঙ মার্চ ও ঢাকা অভিযানের পর সারা দেশ এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। হেফাজতে ইসলাম হল দেশ জুড়ে কয়েক হাজার মাদ্রাসার[১] একটি পিণ্ড। এরা তাদের ১৩ দফা দাবি আদায়ের জন্য লঙ মার্চের কর্মসূচি নিয়েছিল। তাদের ১৩ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে :

১. সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কোরআন–সুন্নাহ বিরোধী সব আইন বাতিল।
২. আল্লাহ, রাসুল সা. ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস।
৩. কথিত শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক–মুরতাদ এবং প্রিয় নবী সা.–এর নামে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধ সহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।
৪. ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী–পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন সহ সব বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
৫. ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।
৬. সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
৭. মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ–ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা।
৮. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে মুসলিমদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ–নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা।
৯. রেডিও–টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাড়ি–টুপি ও ইসলামি কৃষ্টি–কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক–সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস–পোশাক পরিচয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা।
১০. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনগুলোর ধর্মান্তরকরণ সহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
১১. রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম–ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদ জনতার ওপর হামলা, দমন–পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করা।
১২. সারা দেশের কওমি মাদ্রাসার ছাত্র–শিক্ষক, ওলামা–মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম–খতিবকে হুমকি–ধমকি, ভয়ভীতি দান সহ তাদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা।
১৩. অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সব আলেম–ওলামা, মাদ্রাসাছাত্র ও তৌহিদ জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

এই দাবিগুলি যে কোনো সুস্থ–মস্তিষ্ক সুবিবেচক বাংলাদেশির মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দাবিগুলি এককথায় সাংঘাতিক। এই দাবিগুলির পাশাপাশি একটা খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল যে কয়েকজন মহিলা সাংবাদিককে হেফাজতে ইসলামের জনতা মারধোর করেছে। এইসব ঘটনা কোনো প্রগতিশীল মানুষকে বাংলাদেশের ভবিষত সম্বন্ধে বেশ ভয় পাইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

যাই হোক, খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে এইসব দাবি ও কার্যকলাপকে প্রথম দর্শনে অতখানি গুরুত্ব না দিয়ে বরং পুরো প্রক্রিয়াটির আরও কিছুটা সূক্ষ্ম বিচার করা বিচক্ষণতা হবে। বিষয়টি সাদা–কালো দুই রঙে আঁকা নয়। আমরা সকলেই জানি যে শাহবাগ নাস্তিকদের আন্দোলন নয় আর শাহবাগের কর্মীরা দাড়ি–টুপির ধর্মীয় রাজনীতি উৎপাটনের জন্য উঠে পড়ে লাগেনি। আমরা এটাও জানি যে শাহবাগ আন্দোলনের নেতা–সংগঠকদের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ নাস্তিক। এছাড়া,

[১] **সম্পাদকের নোট : ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা দখল করেন, তার আগে বাংলাদেশে সরকারি মাদ্রাসা ছিল ১,৯৭৬টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৭৫,০০০। ২০০২ সালের মধ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫,৬৬১ এবং ছাত্রসংখ্যা ২৮,২৪,৬৭২। মাঝে দুই সামরিক একনায়কের শাসনকালে সেকুলার শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকেও যথেষ্ট উৎসাহদান করা হয়। ওই দুই শাসক বেসরকারি কওমি মাদ্রাসা বৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করেন। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবান্দের শিক্ষাক্রম এগুলিতে অনুসরণ করা হয়। কওমি মাদ্রাসার সংখ্যার কোনো সরকারি হিসেব নেই। বেসরকারি মতে বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ কওমি মাদ্রাসা রয়েছে, ছাত্রসংখ্যা আনুমানিক ২০ লক্ষের বেশি। সূত্র : ইন সার্চ অব অ্যান আইডেনটিটি: দি রাইজ অব পলিটিকাল ইসলাম অ্যান্ড বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম্, লামিয়া কারিম।**

শাহবাগ সমর্থকদের অনেকেই মনে করছিল যে কাদের মোল্লাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোই শাহবাগের বিষয়টার সব নয়। একইভাবে, আমরা যখন হেফাজতে ইসলামের সাম্প্রতিক হামলার বিশ্লেষণ করব, আমাদের চোখ থেকে সাদা-কালোয় দেখার রোদ-চশমাটা খুলে ফেলতে হবে। এটা একটা বড়োসড়ো সমস্যা যে আমরা মাদ্রাসা-জনতার সঙ্গে কচিৎ মেলামেশা করি এবং তাদের সম্পর্কে তেমন জানিও না। অথচ একুশে টিভির সাংবাদিকের সঙ্গে হওয়া ঘটনার মতো বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী থেকে আমাদের গণমাধ্যম ও সামাজিক-মাধ্যম হেফাজতে ইসলামকে একটা দৈত্য বানিয়ে ফেলে। হেফাজতে ইসলাম আন্দোলনের মাদ্রাসা-ছাত্রদের সম্পর্কে আমাদের যেরকম ধারণা, তারা মোটেই সেরকম চিন্তাশীল ব্যক্তি নয়।

হেফাজতে ইসলাম হল হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার একটা ছাতা-সংগঠন। এদের একজোট করেছেন বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার পরিচালক নব্বই-ঊর্ধ্ব শাহ আহমেদ শফি সাহেব। একমাত্র একটা কাজই শফি সাহেব করেছেন, তিনি মাদ্রাসা ভিত্তিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একজন নেতা জুগিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ছাড়া এই হাজার হাজার খণ্ড-গোষ্ঠীগুলি বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারত না। চট্টগ্রাম ও মাদ্রাসা মহলে শফিসাহেব সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকের ধারণা হল, তিনি যা-ই বিশ্বাস করুন, যতই গোঁড়া হন না কেন, তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। তিনি অনুভব করেন, যখন 'ইসলামের মূল মতবাদ' কিংবা স্থিতাবস্থা বিপন্ন, তখন এটা তাঁর ধর্মীয় দায়িত্ব।

এক শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় জুড়ে হাটহাজারী বড়ো মাদ্রাসা নামক এক উচ্চ-প্রভাবশালী সংগঠন গড়ে তোলা, তার প্রসার ঘটানো এবং সর্বোপরি তার নেতৃত্বদানের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এখানে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, তুলনামূলকভাবে এই মাদ্রাসার ছাত্রদের বৈষম্য দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

প্রায় ১৮০০ একর এলাকা জুড়ে রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ৪ একরের ওপর অবস্থিত দারুল উলুম মাদ্রাসা এলাকার মধ্যে হাটহাজারী মাদ্রাসা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ২২,০০০ এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ৫০,০০০। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেলস্টেশন রয়েছে, নিজস্ব ট্রেনও আছে (যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বা তার বাইরে ছাত্রদের অপছন্দের কিছু ঘটে, তারা ওই ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেয়) যেটা চট্টগ্রামের বসতি অঞ্চল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রতিদিন বেশ কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস যাতায়াত করে। ছাত্রদের পড়াশুনা এখানে অবৈতনিক এবং তারা মোটা ভরতুকিতে সামান্য পয়সা দিয়ে ডরমিটরিতে থাকে (মার্বেলের স্থাপত্য শোভিত সেই আবাস)।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় হাটহাজারী মাদ্রাসা-ছাত্রদের জন্য প্রায় কিছুই নেই। তাদের ডরমিটরিগুলোর চেয়ে হাজতে বাস করা আরামদায়ক। তাদের জন্য সরকারি অনুদান প্রায় নেই বললেই চলে। তাদের থাকা ও পড়ার খরচ অনেকটাই আসে বেসরকারি নাগরিকদের দান থেকে।

যদি এই মাদ্রাসা-ছাত্রদের কেউ উত্তেজিত করে তুলতে পারে, ওদের চেয়ে ক্রুদ্ধ আর কে হতে পারে?

হাটহাজারী কো-এডুকেশন শিক্ষার চিত্রটা দেখা যাক। আমরা দেখব, ছেলে আর মেয়েরা একই ঘরের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করে তোলার ব্যাপারে হাটহাজারী মাদ্রাসা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মওলানা শফি এবং তাঁর পূর্বসূরীরা এই শিক্ষাকে ষোড়শ শতাব্দীর পাঠক্রম থেকে বিশ শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে এনেছেন। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকাল স্কুলের ভর্তি ও সরকারি চাকরিতে শত শত গোষ্ঠীর কোটা রয়েছে। মাদ্রাসা-ছাত্রদের ক্ষেত্রে কোনো কোটার ব্যাপার নেই।

বাংলাদেশের ৩০ লক্ষ মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভালো চাহিদা রয়েছে। স্কুল ও কলেজগুলিতে ধর্ম-শিক্ষকের জন্য ইসলামি পণ্ডিতদের চাহিদা রয়েছে। মাদ্রাসাগুলি এই চাহিদার জোগান দেয়।

বাচ্চারা কীভাবে এখানে পড়াশুনা করে? তাদের জন্য রয়েছে ক্লাসরুম কাম ডরমিটরি। সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এগুলো তাদের ক্লাসরুম। এরপর এগুলোই তাদের শোয়ার ডরমিটরি। এখানে একপাশে তাদের বিছানাগুলো গোটানো রয়েছে। এইরকম এক সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে মাদ্রাসা ৫০,০০০ সম্পূর্ণ আবাসিক ছাত্রদের ব্যবস্থপনা করে।

গ্রাজুয়েট স্তরের পড়ুয়া যুবকেরা আসে বাংলাদেশের প্রান্তিক সমাজ থেকে। এদের প্রচলিত শিক্ষা নেওয়ার সঙ্গতি নেই। মাদ্রাসায় না এলে এরা রিকশা চালাত, গ্রামের চাষের জমিতে দিনমজুরি করত। আমাদের সমাজে এদের জন্য কেউ নেই।

এই যুবকদের অধিকাংশ মৌলবাদী ধর্মান্ধ নয়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকাংশ মধ্যপন্থী মুসলমান সংখ্যাগুরু এই দেশের স্থিতাবস্থা রক্ষা করার পক্ষেই রায় দেবে। যদি গুরুত্ব সহকারে এদের ভোটদানের পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেওয়া যায়, অবাক হয়ে যেতে হয়, এই ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকাংশ হয়তো খালেদা জিয়ার দলকে ভোট দিয়েছে, কেউ কেউ শেখ হাসিনার দলকে ভোট দিয়েছে এবং খুব সামান্য ভোট পড়েছে জামাত কিংবা ইসলামি ঐক্য জোটের পক্ষে।

সাম্প্রতিক হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনে আমরা যেটা দেখলাম, তা হল, প্রগতিশীল সেকুলার মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশের একটা প্রতিক্রিয়া। এই গোষ্ঠীর কাছে শাহবাগ আন্দোলন ছিল তাদের প্রাথমিক মূল্যবোধ এবং তাদের কাজ-জীবিকার প্রাথমিক নিরাপত্তার ওপর আঘাত। এই মাত্রাছাড়া আন্দোলন সম্ভবত আমাদের সমাজের এই অংশের কাছে একটা উপলব্ধি সৃষ্টি করেছে যে শত শত বছরের গড়ে ওঠা স্থিতাবস্থা গুরুতরভাবে বিপন্ন।

এই লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শিক্ষকের কাছে মাদ্রাসা হল শেষ সুযোগ। এই শিক্ষা তাদের একটা সামাজিক সম্মান এনে দেয় আর দেয় তাদের বেঁচে থাকার রসদ। যদি এই মাদ্রাসার শিক্ষকেরা বলে, তাদের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে লড়াই করবে। কিন্তু তারা তালিবান ধরনের একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। পরিস্থিতি ঠান্ডা হওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক, এই ছাত্ররাই তাদের কঠিন ক্ষুধার্ত জীবনের স্রোতে ফিরে যাবে, যা শতাব্দী-প্রাচীন স্থিতাবস্থারই পক্ষে। বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দল, যথা আওয়ামি লিগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামাত এটা বোঝে। আমার আশা, আমাদের সাংস্কৃতিক নেতৃত্বও এই বাস্তব সত্যকে খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে।

আমাদের মধ্যপন্থী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমমর্যাদাসম্পন্ন সমানাধিকার সহ স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক, যা গত শতাব্দী জুড়ে রক্ষিত হয়েছে। যদি আমরা একে পশ্চাদ্পদতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের নামে আঘাত করি, আমরা অনিচ্ছুক অথচ মহাশক্তিধর এমন এক দুশমণকে জাগিয়ে তুলব, যাকে জয় করা কখনোই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শাহবাগ আন্দোলনের রেশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন আনিস রায়হানের সঙ্গে। ১০ এপ্রিল 'ইস্টিশন' ব্লগে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারের একটি অংশ এখানে প্রকাশিত হল।

আনিস রায়হান : নির্বাচনী রাজনীতি তো এখন ঘনীভূত। কোন দিকে পরিস্থিতি এগুচ্ছে?

আনু মুহাম্মদ : এখন যা কিছু ঘটছে, সহিংসতা, হামলা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খারাপের দিকেই। মূল সমস্যাটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে শাসকশ্রেণী, তারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া এখনও দাঁড় করাতে পারেনি। আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নটা এখনও অমীমাংসিত। উচিত ছিল এই দুটো প্রশ্ন অনেক আগেই সমাধান করে ফেলা। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। এই বিচারটা অনেক আগেই শাসকশ্রেণীর বড়ো দলগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে সেরে ফেলা দরকার ছিল। তেমনি নির্বাচন কীভাবে হবে, কীভাবে একদল ক্ষমতা ছাড়বে অন্যদল আসবে এটারও একটি পদ্ধতি বের করার দরকার ছিল। এই দুটো প্রশ্নের সমাধান হয়নি। তাই ঘুরেফিরে আমরা পুরনো একই সংকটের বৃত্তে পড়ে আছি। প্রতিবারই নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো দলেরই সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে নজর নেই। দুই দলই চায় যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যেতে। এ জন্যই এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

বার বার ঘুরেফিরে আসছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নটাও। সত্তর দশকের শেষ দিকে এই দাবিতে তৈরি হল যুবকমান্ড। এরশাদের সেনাশাসনের চাপে তা স্তিমিত হল। সেনাবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা ছাড় পেল। সেনাশাসনের মদতে তারা শক্তিশালীও হল। এরপর ১৯৯২-এ শুরু হল আবার। আওয়ামি লিগের আঁতাত-পিছুটানের কারণে সেবারও তা সফলতার মুখ দেখতে পারল না। এখন ২০১৩তে এসে আবার সেই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা আগেই সমাধান হয়ে গেলে তরুণ প্রজন্ম বর্তমানের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য লড়তে পারত। আমাদের অগ্রযাত্রার অনেক প্রতিবন্ধকতা উপড়ে ফেলতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রতিটি প্রজন্মকেই জন্মযুদ্ধের সেই একটি সমস্যা সমাধানেই শক্তিক্ষয় করে যেতে হচ্ছে। মাঝখান দিয়ে ক্রমশ বেড়ে চলেছে সমস্যার বহর।

এই দুই সমস্যা যে আর কতকাল চলবে আমরা তা জানি না। আর কত রক্ত আমাদের দিতে হবে, আর কত নিজেদের সমস্যা ভুলে জীবনধারণটাকেই বড়ো প্রাপ্তি মনে করে বেঁচে থাকতে হবে? এখন যা অবস্থা, তাতে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও এই সহিংসতা-সংঘাত-ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাড়বে। মানুষ তেমন কিছু করবে না, কারণ টানেলের শেষপ্রান্তে আলো পাওয়ার কোনো আশাও তাদের মধ্যে নেই।

আনিস রায়হান : শাহবাগের গণজাগরণ এক্ষেত্রে কি কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে?

আনু মুহাম্মদ : বড়ো দলগুলোর প্রতি জনগণের অনাস্থা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে শাহবাগের গণজাগরণ। এটা একটা বিশেষ কারণ ধরে শুরু হলেও শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষের বড়ো ক্ষোভের জায়গাটা ছিল, এতদিনেও কেন এই বিচার হল না। আরেকটা জায়গা হচ্ছে, এই সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও আগে এই সরকারেরই রেকর্ড আছে জামায়াতের সঙ্গে আঁতাতের। সেই আশঙ্কাটাই মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। তরুণ প্রজন্মকে বেপরোয়া করে তুলেছে।

তরুণ প্রজন্মের জাগরণের ক্ষেত্রে এখানে বড়ো বাধাটা তৈরি করেছে গত ৪২ বছরের অপরাজনীতি। আওয়ামি লিগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মতো বড়ো দলগুলো নানাভাবে দীর্ঘ এ সময়ে ধর্মকে রাজনীতির আনুষঙ্গিক বস্তু করে তুলেছে। এতে করে ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে শক্তির মঞ্চে তাদের অংশীদারিত্ব বেড়েছে অনেক। জামায়াত সেই শক্তিটাকে ব্যবহার করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ধর্মরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। এই খেলায় যোগ দিয়েছে বিএনপি। আমি নিশ্চিত খালেদা জিয়া নিজেও বিশ্বাস করেন না যে, শাহবাগে যারা যায়, সবাই নাস্তিক। কিন্তু তিনি জামায়াতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এটা বলছেন। উদ্দেশ্য একটাই, ভোটের রাজনীতিতে আওয়ামি লিগকে বিপদে ফেলা।

ইসলামপন্থী বিভিন্ন দল এখন মাঠে নামছে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য। কিন্তু যারা ইসলামপন্থী রাজনীতি করে তাদের যদি ইসলামের প্রতি আনুগত্য থাকে নিজেদেরই তো উচিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করতে ভূমিকা রাখা। কারণ এরাই একাত্তরে ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করেছিল। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ করেছিল। ধর্মের নামে অধর্ম চালিয়েছিল তারা। এদের শাস্তি নিশ্চিত করাটা ধর্মীয় রাজনীতি যারা করে, তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

যাই হোক, এগুলো হয়নি। কিন্তু তবু শাহবাগের বড়ো অর্জনটা হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেম এবং সক্রিয়তা। এতদিন সবার ধারণা ছিল তরুণ প্রজন্ম ক্ষমতার দলাদলিতে ব্যক্তিস্বার্থ নিশ্চিত করা আর ক্যারিয়ারের পূজা ছাড়া কিছু করতে সক্ষম না। এই প্রজন্মের ওপর অনেকেই আশা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এই গণজাগরণের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্ম প্রমাণ দিয়েছে দেশপ্রেম ও সততার।

সরকারপক্ষে যারা আছে তারা ঠিকঠাক এই গণশক্তির তাৎপর্যটাকে ধরতে পারেনি। এজন্য তারা গণদাবি, তরুণ প্রজন্মের দাবিকে পাশ কাটিয়ে ধর্মপন্থীদের ভুল ভাঙানোতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। তারা অন্যায় দাবি, মিথ্যা প্রচারণাকে মেনে নিচ্ছে, বৈধতা দিচ্ছে। তাদের শর্ত মেনে নিচ্ছে। এগুলো করে ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে তাদের সখ্যতা যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা কাটানোর চেষ্টা করছে। ক্ষমতা থেকে ধর্মীয় রাজনীতি হঠানোর স্পিরিট ধ্বংস করে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক যে সমাজের আকাঙ্ক্ষা তা আবারও পিছিয়ে গেল।

আনিস রায়হান : সরকার তো জনসমর্থন পাচ্ছে? জামায়াত নিষিদ্ধের উদ্যোগ নিতে সমস্যা কোথায়?

আনু মুহাম্মদ : শাহবাগের গণজাগরণের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে তা অনেক বড়ো। বর্তমান সরকারের যে রাজনৈতিক নীতি ও বিন্যাস আছে তার দ্বারা এই প্রত্যাশার চাপ পূরণ করা সম্ভব না। কিছু করতে হলে সরকারের অনেক সময় লাগবে। এ কারণেই জটিলতা তৈরি হয়েছে। যেমন, সরকারের পক্ষ থেকে, বার বার গণজাগরণ মঞ্চের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। জামায়াত নিষিদ্ধের কথা সরকারের মন্ত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন। জনগণ আশা করেছে, মন্ত্রীরা দায়িত্ব নিয়েই এসব কথা বলেছেন। এর ফলে

প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে যে, সরকার মনে হয় জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে চায়। এখন সেই প্রত্যাশা থেকেই আলটিমেটাম এসেছে। কিন্তু সরকার নীরব। তরুণদের মধ্যে যারা একেবারেই আপস করতে রাজি না, তারা এটা মেনে নিতে পারছে না। আবার যেহেতু তারা মনে করে এই সরকারই বিচার করবে তাই সরকারবিরোধী আন্দোলনে তারা নামছে না। বাধ্য হয়ে নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেই তারা দাবি আদায়ের জন্য লড়াই চালাচ্ছে।

কিন্তু সরকার এখনও নীরব। বেশিক্ষণ তারা চুপ থাকতে পারবে না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেই তাদের দায় আছে। এ জন্যই ছেলেমেয়েরা শেষ দেখে নিতে চাচ্ছে। যদি আওয়ামি লিগ এই প্রত্যাশার জায়গা না তৈরি করত তাহলে তরুণরা হয়তো দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের পথে যেত। কিন্তু এখন তারা হয় জয়, নয় ক্ষয় এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না, সরকার বেশি কিছু করবে। কিছু করার কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিকভাবে জামায়াত যেসব তৎপরতা চালাচ্ছে সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছে না। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যারা কিনা আওয়ামি লিগের বিরাট সমর্থক, তারাই অভিযোগ তুলছে সরকার ট্রাইবুনালকে যথেষ্ট লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়নি। প্রসিকিউটরদের অধিকাংশই দুর্বল। তাছাড়া এমন সব মন্তব্য সরকারের নেতৃবৃন্দ করেন, যা দেখে মনে হয় তাঁরা নিজেরাই হাতে ধরে জামায়াতের কাছে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। আইন থাকা সত্ত্বেও সরকার বলছে আইন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মোটকথা, দীর্ঘদিন ধরে দুধ কলা দিয়ে পোষার কারণে জামায়াত–শিবির তো এখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এই শক্তির বিন্যাসের জন্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে যেভাবে কাজ করতে হবে তার কোনো লক্ষণ সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। সরকারের কর্মকাণ্ডই সরকার থেকে মানুষকে দূরে রাখে। ছাত্রলিগ–যুবলিগ যদি জনগণের ওপর সারাক্ষণ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাহলে তো আর জনগণ এই দলের পাশে এসে দাঁড়াবে না। যদি এরা দখল লুণ্ঠন চালিয়েই যায় তাহলে তো মানুষ এদের সমর্থন করবে না। এই সুযোগটাই এখন জামায়াত নিচ্ছে।

আওয়ামি লিগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই। কারণ কথাগুলো বলে তারা ভোটের রাজনীতির জন্য। আর কাজগুলো না করতে পারার কারণ তাদের ওই নৈতিক দৃঢ়তা নেই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আওয়ামি লিগের জামায়াত বিরোধিতা মতাদর্শিক বা রাজনৈতিক না। এটা সম্পূর্ণই কৌশলগত। নির্বাচনী হিসাব নিকাশের অংশ হিসেবেই তারা এ নিয়ে তৎপরতা দেখায়। তারা শত্রু মনে করে বিএনপিকে। সেক্ষেত্রে বিএনপিকে পর্যুদস্ত করার জন্য প্রয়োজনে জামায়াতের সঙ্গে আপসরফায়ও তারা যেতে পারে। কাদের মোল্লার রায় দেখে মানুষ সেই আশঙ্কাতেই পড়ে। শাহবাগ গণজাগরণের ফলে এই পথটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আওয়ামি লিগ রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক জায়গা থেকে এখনও প্রস্তুত না। কেবলমাত্র বিশাল গণআন্দোলনই পারে সরকারকে দিয়ে এই কাজটা করাতে।

আনিস রায়হান : এখানে তো আওয়ামি সমর্থক তবে আওয়ামি নয় এমন অনেকে আছে। এরা কি সরকারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে না?

আনু মুহাম্মদ : এই আন্দোলনে সরকারি দলের একটা অংশ, তাদের সমর্থক, তাদের বিরোধী ও একেবারেই রাজনীতি সচেতন নয় এরকম সবগুলো শ্রেণীরই অংশগ্রহণ আছে। আওয়ামি লিগেরই অঙ্গ ছাত্রলিগ, এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখানে এসেছে। কারণ তারা থাকলেও কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বটা তাদের ছিল না। মানুষ যখন দেখল, এখানে জাহানারা ইমাম ছাড়া আর কারও ছবি উঠছে না, তখন মানুষ এখানে থেকে গেল।

সরকারপক্ষও ততক্ষণ এটাকে ধারণ করেছে যতক্ষণ আন্দোলনের আঙ্গিকটা সরকারের পক্ষে গেছে। এখন যখন দাবি সুনির্দিষ্ট হয়েছে, আলটিমেটাম এসেছে সরকার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে। এখন মঞ্চকে কেন্দ্র করে ঐক্যটা ধরে রাখতে হলে সরকারকে কিছু প্রশ্নে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। এটা না করতে পারলে আওয়ামি লিগ কর্মীদের চেয়ে বড়ো সমস্যায় পড়বে মাঠে এবং অনলাইনে আওয়ামি ধারার সমর্থক গোষ্ঠীটি। তারা চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এই মানুষগুলো পিছিয়ে আসতে পারবে না।

আনিস রায়হান : আন্দোলনের গতি কোনদিকে যেতে পারে বলে মনে হয়?

আনু মুহাম্মদ : এভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। তবে আন্দোলনের মধ্যে বহুবিধ ধারা তৈরি হবে। এই আন্দোলনের রেশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়বে।

আখতার হোসেন : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আর একবার গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে একটা চাকরির জন্য সিপিআই নেতা কমলাপতি রায় ও জ্যোতি লাহিড়ী স্যারের কাছে এসে প্রস্তাব দেন। আমার সামনে কমলাপতিদা বলেছিলেন — 'আখতার তোমাকে একটা চাকরি করতে হবে।' স্যার তখন বলেছিলেন, 'চাকরি করব না, স্কুল করব। স্কুলের চাঁদা তুলতে যাচ্ছি, আপনিও চলুন।' এই হল আখতার সাহেব। তবে উনি একবার নমিনেটেড বোর্ডে গার্ডেনরীচ পৌরসভার মনোনীত কমিশনার হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে প্রচণ্ড আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হয়েছেন, বড়ো হয়েছেন। মধ্যবর্তী সময়ে কিছুটা অস্বচ্ছলতাও এসেছে। এ নিয়ে ওঁর কোনো খেদ ছিল না। সব কিছু সহনশীলতার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। ওঁর স্ত্রী নূরজাহান আরও বেশি সহনশীলা। সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব মাথায় নিয়ে শাকিলদের চার ভাই দুই বোনকে বড়ো করে তুলেছেন। পরবর্তী সময়ে আখতার স্যার বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু মানসিকভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না।

আজ স্যার নেই। পরিণত বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চিরকালের জন্য। পড়ে রয়েছে শিক্ষা–সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড।

এখনও বিষের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়নি, তুমি কথা বলো!

আসিফ মহিউদ্দিন

---

৮ মার্চ 'মুক্তমনা' ব্লগে লেখকের এই লেখা (পোস্ট) প্রকাশিত হয়। এপ্রিল মাসের গোড়ায় আসিফ মহিউদ্দিন এবং আরও তিনজন ব্লগারকে বন্দি করা হয়। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্লগে লেখার মাধ্যমে এঁরা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন। এর আগে ১৩ জানুয়ারি আসিফ মহিউদ্দিনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতকারীরা।

অবশেষে মাননীয় আদালত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে শুরু করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, গোয়েন্দা পুলিশ এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কাছে আমার হত্যা-চেষ্টার তদন্তের ফলাফল নিজ উদ্যোগেই জানতে চেয়েছেন এবং নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে একটি রুল জারি করেছেন। মাননীয় আদালতকে এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, সরকারের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলনের কারণে সরকার বাহাদুর সম্ভবত আমার উপরে ভালো পরিমাণই বিরাগভাজন হয়েছে, এবং তারা যা পরিকল্পিতভাবেই ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল, মাননীয় আদালত তা জানতে নিজেই সরকারকে তলব করেছেন।

যেহেতু আওয়ামি ঘরানার মানুষ নই, কট্টর আওয়ামিপন্থী ব্লগারদের অনলাইন জোটের অন্যতম চক্ষুশূল বলেই আমি পরিচিত, তাই আমাকে হত্যার চেষ্টার সময় সরকার থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা আমি পাইনি, এমনকী আমার মামলাটি তারা আমলেই নেননি। কিছু সূত্র থেকে জানতে পেরেছি, আমার ওপরে বর্বর আক্রমণের পরে কয়েকজন আওয়ামিপন্থী ব্লগার অনলাইনে উল্লাস প্রকাশ করেছে জামাত শিবির-হিজবুত তাহরীরের পাশাপাশি। আমি জানি না তারা কী পদার্থে তৈরি, কিন্তু একজন মানুষকে হত্যার বর্বর চেষ্টার সময় অন্য একজন মানুষ, তাদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক, তারা কীভাবে উল্লাস করে!

অসুস্থ অবস্থায় বারবার আমি বলেছি, আমার ওপরে এই হামলার পিছনে ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী রয়েছে, তখন আমার কথা তারা মোটেও আমলে নেননি। এমনকী প্রচারমাধ্যমকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আমার ওপরে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণকে যেন গুরুত্ব সহকারে না ছাপানো হয়।

না, তাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ, কোনো ঘৃণা, কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা নেই। তারা তাদের কাজটিই করেছে, তারা তাদের পন্থাতেই তাদের পরিচয় জানিয়ে গেছে। তারা আমাকে পিছন থেকে একের পর এক চাপাতি এবং ছুরি দিয়ে ক্রমাগত কুপিয়ে গেছে, আমাকে বর্বরের মতো হত্যা করতে চেয়েছে, এবং অবশেষে আমাকে রক্তাক্ত করে, ক্ষতবিক্ষত করে চোরের মতো দৌড়ে পালিয়ে গেছে। হামলার ধরন দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তারা আমার গলাটি শরীর থেকে আলাদা করে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তারা জানত না তারা কী করছে, তারা জানে না তারা কী করেছে। ধর্ম-জাতীয়তাবাদ-রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব মানুষের মানসিকতা এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, মানুষের মানসিকতা এমন ভাবে দখল করে ফেলে যে, তারা আর যৌক্তিক চিন্তাভাবনার মাঝে বসবাস করে না। তাদের কেউ হয়তো কোনো মাদ্রাসার ছাত্র, অথবা শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, যারা তাদের প্রাচীন কুসংস্কার থেকে একটুও বের হতে পারেনি। যাদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে বিধর্মী-নিধর্মী-মুক্তমনা-মুক্তচিন্তার মানুষ মাত্রই ঘৃণ্য, তাদের হত্যা করাটাই পৃথিবী এবং তাদের ঈশ্বরের কাজ করা। তাদের ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক গুরু হয়তো তাদের নির্দেশ দিয়েছে এই কাজটি করতে, তারা অনুগত ভৃত্যের মতো নিজের বিবেক এবং মস্তিষ্ক না খাটিয়েই কাজটি করেছে।

সাধারণত লেখার কারণে চোরাগোপ্তা আক্রমণ, হত্যার চেষ্টা তখনই করা হয়, যখন তারা আর আলোচনা বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। শেষ অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করে চাপাতি এবং বোমা, হত্যা করে মুখ বন্ধ করে দিতে চায় সবসময়। তারা জানে না যে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করা যায় না, অর্জন করা যায় ঘৃণা এবং ভীতি। আমার লেখা হয়তো তাদের ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক গুরু বা পীর সাহেবদের পছন্দ হয়নি। কারো সব লেখা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পছন্দ হওয়া শুরু করে, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে লেখকটির মতো চরিত্রহীন এবং ভণ্ড আর দ্বিতীয়টি নেই। একজন চিন্তাশীল মানুষ যখন পাঠকের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে লিখবে, পাঠক যেভাবে চায়, যেমন করে চায় সেভাবে নিজেকে তৈরি করবে, তখন সে আর মননশীল থাকে না, হয়ে পরে নিকৃষ্টমানের বুদ্ধিবেশ্যা — যে নিজেকে নানা রঙে রাঙিয়ে পাঠকের মন জয় করতে আগ্রহী, পাঠককে সুড়সুড়ি দিতে আগ্রহী। তাদের নাড়া দিতে, পাঠকের চেতনার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়ে নতুন মননশীলতা সৃষ্টি বা চিন্তার জগতকে নতুন আলো দেখাবার ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। কারো যদি আমার লেখা পছন্দ না হয়ে থাকে, তবে খুব সহজেই আমার লেখা এড়িয়ে চলা যায়। আমার লেখা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জামাতানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো আওয়ামিয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো ভগবানানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো মুহাম্মাদানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো আল্লানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো সেনাবাহিনীয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জাতীয়তাবাদানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো সরকারানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো মুজিবানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জিয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, এরকম লক্ষ লক্ষ অনুভূতিতে আমার লেখা আঘাত করতে পারে। আমি জনগণের এই সমস্ত নানাবিধ অনুভূতির রক্ষাবেক্ষণের দায় নিইনি, যারা তাদের এই সকল অনুভূতি অক্ষত রাখতে চাইবেন, তারা নির্দ্বিধায় আমার লেখা এড়িয়ে চলে যাবেন, কাউকে আমি আমার লেখা পড়তে বাধ্য করিনি। আমার বাক-স্বাধীনতার ব্যবহার আমি করে যাব, আমার কথা আমি বলে যাব। সময় নির্ধারণ করবে আমি সঠিক ছিলাম নাকি তারা, সময় নির্ধারণ করবে আমি কতটা সফলতার সাথে ব্যর্থ হয়েছিলাম, সময় নির্ধারণ করবে আমি সময়ের চাইতে কতটা অগ্রসর ছিলাম নাকি ছিলাম পশ্চাৎপদ।

সেদিন রিকশায় করে অফিসের গেটের সামনে আসতেই দেখলাম একটু দূরে অন্ধকারে তিনজন বা দুইজন ছেলে গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ওই বিল্ডিঙের কেউ হবে ভেবে আমি তাকালাম না, নেমে রিকশা ভাড়া ২০ টাকা এগিয়ে দিয়ে বললাম, পাঁচ টাকা ফেরত দিন। সাথে সাথেই মাথার পেছনে চাপাতির বাট অথবা অন্য কোনো ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হল। এক সেকেন্ড মাথাটা ঝিম হয়ে গেল, কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। এর মধ্যে আমার মাথাটিকে বগলের মধ্যে নিয়ে একজন আমাকে চেপে ধরল, আরেকজন পিছন থেকে কোপানো শুরু করে দিল। পিঠে, ঘাড়ে এবং গলায় তখন কোপানোর আঘাত একের পর এক এসে লাগছে। তবে খুব ভালোভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে না, মাথার যন্ত্রণায় পিছনে কোপানোর ব্যথাগুলো বেশি লাগছিল না। শুধু বুঝতে পারছিলাম পিছনে মারাত্মক কিছু ঘটে যাচ্ছে। চশমাটা প্রথম আঘাতের সময়ই চোখ থেকে পড়ে গিয়েছিল। গায়ে ভারী এবং মোটা একটা জ্যাকেট ছিল, টের পাচ্ছিলাম আমার পিঠের ওপরে কেউ প্রায় চড়ে বসেছে এবং খুব প্রফেশনাল ভঙ্গিতে কুপিয়ে যাচ্ছে। প্রফেশনাল ভঙ্গি বললাম এই কারণে যে, পুরো সময়ে তারা মুখ থেকে টুঁ শব্দটিও বের করেনি। সাধারণ আক্রমণকারী বা

উত্তেজনার বশে যারা আক্রমণ করতে আসে, তারা আক্রমণের সময় গালি দেয়, মুখ দিয়ে নানা ধরনের আওয়াজ করে। এটা আক্রমণের স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু তারা পুরোটা সময় মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করেনি, যা থেকে বোঝা যায় তারা এই কাজে দক্ষ, দক্ষ না হলে মুখ দিয়ে অন্তত গালি দিত, বা আল্লাহু আকবর বলত, বা অন্তত পক্ষে আহ উহ শব্দটুকুও করত।

প্রথমেই তারা আমার মাথাটিকে বগলের ভেতরে ধরে অন্য হাত দিয়ে একটি ছুরি সামনে থেকে গলা বরাবর ঢুকিয়ে দেয়। এই আঘাতটি ছিল সবচাইতে মারাত্মক, পরে যেটা ডাক্তার জানিয়েছিলেন। মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে একটি ভেইন সরাসরি মস্তিষ্কে চলে যায় এবং সেটা কেটে দিতে পারলে কয়েক মিনিটেই রক্তক্ষরণে মানুষের মৃত্যু ঘটবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই আঘাতটি আমার জ্যাকেটের হুডে লেগে গলার একটা বড়ো অংশ কেটে বেড়িয়ে যায়। আমার গলাটি দুইভাগ করে ফেলার চেষ্টাই ছিল তাদের। এরপরে তারা পিঠে এবং ঘাড়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকে। প্রতিটি আঘাতই ছিল সরাসরি ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়া। ঘাড়ের দুই পাশে তারা এমনভাবে গভীর আঘাত দুটি করে, যেন আমার ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ড কেটে ফেলা যায়। একটি আঘাত ছিল ৬ সেমি গভীর, আরেকটি ৪ সেমি গভীর। দুটো স্পাইনাল কর্ডের একদম পাশ ঘেঁষে ঢুকে গেছে, আর আধা সেমি পাশে লাগাতে পারলে আমাকে আর দেখতে হত না!

চশমাটা পড়ে গিয়েছিল, রাস্তাটিও অন্ধকার ছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময়, আমি ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই আমাকে অনেকগুলো কোপ দেওয়া হয়েছে। আমি তখন বেঁচে থাকার আকুতিতে প্রবল শক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, গা ঝাড়া দিলাম। তারা আমার পিঠ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন আবার এগিয়ে এল, এসে আমার পেট লক্ষ্য করেই সম্ভবত চাপাতি চালালো। এই কোপটি আমার শরীরের বাম দিকে লাগল, হাড্ডিতে গিয়ে ঠেকলো; ঘুরে যাবার কারণে পেটে লাগলো না। পেটে লাগলে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যেত।

এরপরে তারা যা করার করে ফেলেছে ভেবেই দৌড় দিল। একটু সামনের দোকান থেকেও আমার চিৎকার শুনে দুইজন ভদ্রলোক ছুটে এলেন। শুনতে পেলাম, কেউ বলছে, হায় হায়, 'পুরাই মার্ডার কইরা ফালাইছে দেখি। ভাই আপনেরে তো কোপাইছে'।

এই কথা শোনার পরে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমার শার্ট প্যান্ট এবং রাস্তা সবই রক্তে ভিজে গেছে। আমার হাতে তখনও আমার এন্ড্রয়েড ট্যাবটা ধরা, তারা ট্যাব মোবাইল বা মানিব্যাগের দিকে ফিরেও তাকায়নি। একজনকে বললাম ভাই চশমাটি খুঁজে দেন, সে খুঁজে দিল। আমি চশমাটা পরেই জিজ্ঞেস করলাম, হাসপাতাল কোনদিকে। একজন রাস্তার ওই পারের হাসপাতালটি দেখিয়ে দিল। আমি দৌড়ে বড়ো রাস্তাটি পার হয়ে হাসপাতালে ঢুকে গেলাম।

হাসপাতালে ঢুকে চিৎকার দিয়ে বললাম, ডাক্তার ডাকেন, রক্ত থামান। তাড়াতাড়ি রক্ত না থামালে মরে যাব। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলল। তারা সম্ভবত পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসার আগে তারা আমাকে স্পর্শও করবে না। আমি তখন চিৎকার দিয়ে তাদের ধমকাচ্ছি, কিন্তু তারা বিশেষ কিছুই করছে না। পুলিশ আসার পরে তারা আমার শরীর থেকে রক্তগুলো মুছে দিল, গেঞ্জিটা কেটে ফেলল এবং জ্যাকেটটা খুলে দিল। এরপরে ক্ষতগুলো দেখে তারা আমাকে বলল, আপনি মনসুর আলী হাসপাতালে চলে যান। আপনার অপারেশন লাগবে।

একজন একটা রিকশা নিয়ে এল, সেই আমাকে টেনে রিকশায় তুলল, আমি চললাম মনসুর আলী হাসপাতালে। তখন বাসায় বড়ো বোনকে ফোন দিলাম, সে ফোন ধরছিল না। দুলাভাই পরে ফোন ধরল, তাকে বললাম চলে আসতে। এরপরে বাকী বিল্লাহ ভাই এবং অনন্য আজাদকে ফোন দিলাম নিজেই, ফোন দিয়ে বললাম আমাকে কুপিয়েছে। ততক্ষণে রিকশা হাসপাতালে চলে এসেছে।

ওই হাসপাতালে তখন ডাক্তাররা একটা অপারেশন করছে, তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলল। অন্যমনস্ক শরৎ ভাই তখন ফোন দিলেন, আমি শুনলাম সে ফোন দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। এদিকে সামহোয়্যার ইন ব্লগে ততক্ষণে পোস্ট করে ফেলা হয়েছে, কয়েকজন ব্লগার মনসুর আলী হাসপাতালেও চলে এসেছে। তাদের একজন হচ্ছেন সেলিম আনোয়ার ভাই। তিনি এসে ডাক্তারদের বললেন, উনি অনেক বিখ্যাত ব্লগার, ওনার কিছু হলে একটারও চাকরি থাকবে না। এই কথা শুনে কয়েকজন ডাক্তার আমার রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করলেন। পিছনের কয়েকটা ক্ষত তিনি সেলাই করলেন, কিন্তু ঘাড়ের ক্ষত দুটো দেখে বললেন এই ক্ষততে অপারেশন লাগবে। এখান থেকে সব নার্ভ মস্তিষ্কে যায়, এখানে সামান্য এদিক সেদিক হলে আমি মারা যাব। তিনি আমার ডান দিকের ক্ষতটাকে আঙ্গুল ঢুকালেন, এবং বললেন তাঁর পুরো আঙ্গুল ঢুকে যাচ্ছে, ক্ষতটা এতই গভীর। এবং অন্যদের বললেন সম্ভবত বাঁচানো যাবে না।

ততক্ষণে বাকী ভাই, মাহবুব রশিদ, শফিউল জয় থেকে শুরু করে আমার দুলা ভাই, ভাগিনা অনিন্দ্য, অনন্য আজাদ সহ অনেক পরিচিত লোকজন চলে এসেছে। ডাক্তার ঢাকা মেডিকেলে ট্রান্সফার করলেন কোনোমতে ঘাড়ের ক্ষত দুটো ব্যান্ডেজ করে দিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং বুঝে উঠতে পারছিলাম না বাঁচব কিনা! অনন্য আজাদ তখন কাঁদছে, সে কী ভাবছিল জানি না। হঠাৎ দেখি সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে চুমু দিয়ে বসেছে। আমি সেই অবস্থাতেও হেসে দিলাম এটা দেখে।

অ্যাম্বুলেন্স এলে চলতে শুরু করলাম। ভাগিনা অনিন্দ্যর মুখ থমথম করছে, বার বার আমাকে জাগিয়ে রাখছিল, আমার ঘাড় দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে যেন গাড়ির ধাক্কায় বাঁকা হয়ে না যায়। পরে বুঝেছিলাম আমার স্পাইনাল কর্ডের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, গাড়ির ধাক্কায় স্পাইনাল কর্ডের কিছু হলে পুরো শরীর প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারত। বড়ো বোনেরা চলে এসেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে, মিনু মনি ছন্দা চন্দনা আপার অবস্থা তখন ভয়াবহ, পরে মুমু আপাও চলে এসেছিল, দেশের বাইরে থেকে আরেক বোন তখন খালি ফোন করে যাচ্ছে।

ঢাকা মেডিকেলে এসে দেখি মনিরুদ্দিন তপু ভাই, ফারুক ওয়াসিফ ভাই এবং মাহবুব শাকিল ভাই ইতিমধ্যে অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। হাসপাতালে ডঃ ইমরানও উপস্থিত আছেন, ওনার সাথে ফেসবুকে কথাবার্তা হত। তিনি বললেন তিনি আমার লেখা নিয়মিতই পড়েন। ফেসবুকে খবর শুনে বাসা থেকে ছুটে এসেছেন।

এরপরে আমাকে এক্স রে করতে পাঠানো হল, চোখ খুলে দেখি অনেক লোক এসে পড়েছে। সেই ঘোরের মধ্যে সবার কথা মনেও নাই, মাহবুব রশিদ, বাবু আহমেদ, তাওসীফ হামিম আর বাধন স্বপ্নকথককে দেখলাম মনে হল। আমি তখন পুরোপুরি সেন্সে আছি, বোঝার চেষ্টা করছি তাদের কথাবার্তা, বাঁচব কি বাঁচব না! সবার মুখের অবস্থা দেখে তখন মনে হচ্ছিল মারা যাব। হঠাৎ ইচ্ছা হল, মারা যাবার আগে একটা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে যাই। মাহবুব

রশিদ পুরনো বন্ধু, তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম সিগারেট আছে কিনা। সব মানুষগুলো তখন আরো জোরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল! ভাবলো মাথায় আঘাত লাগায় মাথা পুরাই গেছে!

এরপরে ডক্টর প্রতাপ, তার সাথে সামহোয়্যারের আরেকজন ব্লগার কাম ডাক্তার ইনকগনিটো এবং একজন মহিলা ডাক্তার আমাকে নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করলেন। অপারেশনের রুমে তখন শুয়ে শুয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপছি। ডঃ প্রতাপ অপারেশন রুমে প্রথমে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে চেষ্টা করলেন এবং আমাকে হার্ট ফাউন্ডেশনে পাঠাবেন কিনা তা নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। গলার কাছে তখন ফুলে গেছে বিকট ভাবে, রক্ত জমাট হয়ে আছে। সেটা অনেকখানি কেটে তিনি নিশ্চিত হলেন আমার গুরুত্বপূর্ণ ভেইনটি কাটেনি।

এরপরে ঘাড়ের ক্ষত দুটো দেখে আমার বোনের কাছ থেকে বন্ড সাইন করালেন যে, আমি মারা গেলে ডাক্তারদের কোনো দায় থাকবে না। এই কথা শুনে তাদের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। তারপরে ডাক্তার আমার ঘাড়ের ক্ষতটাতে আঙ্গুল ঢোকালেন, এটা দেখার জন্য যে ওই জায়গার নার্ভগুলো কতটা ঠিকঠাক আছে। সেই মুহূর্ত কী ভীষণ যন্ত্রাদায়ক ছিল তা বোঝানো যাবে না, যার এরকম হয়েছে সেই শুধু বুঝবে। শরীরের সব নার্ভ সেখান দিয়ে পাস হয় বলে সেটা শরীরের অন্যতম সেনসিটিভ জায়গা। আমি তখন গলাকাটা গরুর মতো চিৎকার করছি, আমার চিৎকার শুনে পাশের রুমে বাবু আহমেদ এবং আমার আরেক ভাগিনা হিমালয় সেন্সলেস হয়ে ধরাম করে পড়ে গেল। ক্ষতটিতে পুরো আঙ্গুল ঢুকে যাবার পরে ডাঃ প্রতাপ আবার আরেকটি বন্ড সই করালেন, কারণ বাঁচবার আশা খুব কম ছিল এবং অপারেশন শুরু করলেন জেনারেল অ্যানেস্থাশিয়া দিয়ে। জ্ঞান হারাবার আগে শুধু দেখলাম ডাঃ ইমরান ঘেমে-টেমে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ডাঃ প্রতাপ আর আরেকজন মহিলা ডাক্তার আমার ওপরে ঝুঁকে আছে।

৭০টার ওপরে সেলাই, মোট আটটি আঘাত, দুটো ক্ষতের গভীরতা ৬ সেমি এবং ৪ সেমি, তিনব্যাগ রক্ত দিয়েছে ছোটোভাই সৌরদীপ দাসগুপ্ত, আমার ভাগিনা অনিন্দ্য এবং নাসিম ভাই। জ্ঞান যখন ফিরল, দেখলাম মুখ থেকে নাক থেকে কী জানি বের হচ্ছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে মারা যাচ্ছিলাম, কে জানি মুখে কী দিলেন, মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার করার পরে বেঁচে উঠলাম। তারপরে কড়া ওষুধের প্রভাবে কয়েকঘন্টা ঝিম মেরে ছিলাম। পরে ডাক্তারের সাথে যখন কথা হচ্ছিল, তারা বিস্ময় প্রকাশ করছিল যে, এত বড়ো আক্রমণের পরেও আমি কীভাবে নিজেই হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছেছি! ডাক্তার প্রতাপ বলেছেন, দৃঢ় মানসিক বল এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি না থাকলে এইরকম আঘাত থেকে বেঁচে ফেরা অসম্ভব ব্যাপার।

সকালে বড়োবোন এসে বলল, আমার ভালোবাসার মানুষটি এসেছে, কিন্তু তাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাইরে বসে কাঁদছে। আমি অনেক কষ্টে তাকে বললাম, ওকে নিয়ে আসো। সে এসে যখন হাত ধরল, বুঝতে পারলাম এ যাত্রা বেঁচে গেছি, আর কোনো ভয় নাই। বেচারি সারারাত কান্নাকাটি করেছে, আমার চাইতে তার ওপর দিয়েই বেশি ঝড়ঝাপটা গেছে মনে হল। চুলগুলো পুরা কাকের বাসা করে চলে এসেছে। তাকে দেখলেই আমার সব সময় হার্টবিট বেড়ে যায়, এবারেও সেটাই হল। তখন আমার সারা শরীরে অসংখ্য নল লাগানো, কড়া ওষুধের প্রভাবে আমি নেশাগ্রস্তের মতো তাকিয়ে আছি। এই সময়ে মনে হচ্ছিল আবার জীবন ফিরে পাচ্ছি।

অসংখ্য ব্লগার, অসংখ্য মানুষ আমার জন্য ছুটে এসেছেন, আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ব্লগার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছেন। এই ভালোবাসার ঋণ আমি কীভাবে শোধ করব জানি না। কয়েকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকেও সাবধান করা হয়েছে, এত মানুষের আসা যাওয়া নিয়ে। তার ওপরে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে সবাই ধারণা করেছে, আমি কোন বিশাল ব্যক্তিই হব হয়তো। কারণ তা না হলে এত মানুষ দেখতে আসে না, ভালোবাসা জানাতেও আসে না।

আবার অনেকেই আমাদের না জানিয়েই অনেক কাজ করে দিয়ে গেছেন, আমার পাশের সিট সবসময়ই খালি ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি সিট খালি পড়ে আছে, এমন ঘটনা খুব স্বাভাবিক নয়। এই কাজটি কে করে দিয়েছে তা এখনও জানতে পারি নি। মানুষের ওপরে আস্থা হারাইনি, হারাব না কোনোদিন। আমার ওপরে যারা আক্রমণ করেছিল তারাও মানুষ, আবার আমার জন্য যারা সারাটা রাত অক্লান্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করেছে, কেঁদেছে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রার্থনা করেছে, তারাও মানুষ। এই অফুরন্ত ভালোবাসাই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে মৃত্যুর হাত থেকে। অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য ব্লগার, অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী খুব গোপনে এসে দেখে গেছেন, ভালোবাসা জানিয়ে গেছেন, কোনো না কোনো ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সবার কথা এখন স্মরণে নেই কড়া ওষুধের প্রভাবের কারণে। তবে তাঁদের এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।

তবে 'বদলে যাও বদলে দাও' অর্থাৎ 'প্রথম আলো' গোষ্ঠী এই ঘটনার পরে খুব বাজে ভাবেই নিজেদের প্রগতিশীল মুখোশ খুলে নগ্ন মূর্তি ধারণ করেছিল। 'ডয়েচ ভেলে' থেকে একটি পুরস্কার পাবার পরে খুব যত্ন সহকারে আমার নামটি পত্রিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, বাকি যারা পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের নাম থাকলেও সেখানে আমার নামটি ছিল না অজ্ঞাত কারণে। আর এবারও তারা আমার ওপরে হত্যা প্রচেষ্টাকে সাধারণ ছিনতাইয়ের ঘটনা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে, এবং পরের দিন জানায় যে, ডেস্কে আমার রিপোর্টটি জমা দেওয়া হয়েছিল, সেটি প্রথম পাতাতে বড়ো করেই যাবার কথা ছিল, কিন্তু হায়, সেটি নাকি ডেস্ক থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই আমার খবরটি স্থান পায় পত্রিকাটির একদম এক কোনায়, তাও সেখানে বলা হয় এটি ছিনতাইয়ের ঘটনা! প্রথম আলোর এই ধরনের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক, তারা ব্লগারদের সম্ভবত ফান ম্যাগাজিনের জোকস লেখক ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবতেই রাজি নয়। তবে শাহবাগ আন্দোলনের পরে তারা ব্লগারদের নিয়ে আবার মাতামাতি শুরু করেছে। এটা অবশ্য ভালো দিক বটে।

তবে অন্যান্য পত্রিকাগুলো সেসময়ে অত্যন্ত ভালোভাবে রিপোর্ট করেছে, তার জন্য তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সমকালে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী একটি অনবদ্য কলাম লিখেছেন, তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ দেওয়াটাও ধৃষ্টতা হবে।

আমাকে আক্রমণের পরে গতমাসে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকেও একই কায়দায় আক্রমণ করা হয়, একই কায়দায় হত্যা করা হয়। তাকে জবাই করে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। মেঘদলের গানটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক :

ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং, ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তত্পদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইক আল্লাহ শারিকা লা,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নেয়ামাতা, লাকা ওয়ালমুল্‌ক্

লা শারিকা লা।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
বল হরি, হরিবোল, তীর্থে যাব
বিভেদের মন্ত্রে স্বর্গ পাব।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু,
মানুষ কোরবানী মাশাল্লাহ্।
হালেলুইয়া জেসাস ক্রাইস্ট,
ধর্মযুদ্ধে ক্রুসেড বেস্ট।

রাজীব হত্যা মামলায় ৫ জন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ধরা পড়েছে এবং নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসী তৈরির ঘাঁটি কী না, তা খতিয়ে দেখতে আদালতে একটা রুল জারি হয়েছে। তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই তারা নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি আধুনিক এবং মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কোনো কওমি মাদ্রাসার ছাত্র হলেই বরঞ্চ তাদের বেশি মানাতো। জানা গেছে, তারা তাদের এক শিবির কর্মী বড়োভাই, যে তাদের প্রায়শই ইসলামি জলসায় সবক দিত, সে এই হত্যা করতে হুকুম দেয়। নির্বোধ ধর্মান্ধ ছেলেগুলোর সাথে রাজীবের বিন্দুমাত্র কোনো শত্রুতা ছিল না, রাজীব সম্পর্কে তারা কিছু জানতও না। কিন্তু তাদের বলা হয়েছে 'রাজীবের ব্লগের কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে দাবিকৃত, যেই ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন, সেই ইসলাম এখন হুমকির মুখে, সর্বশক্তিমান আল্লাহও এখন হুমকির মুখে, ইসলাম এবং আল্লাহকে রক্ষা না করলে আর হচ্ছে না'; তাই তারা চাপাতি দিয়ে একজন নিরস্ত্র ব্লগ লেখককে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষে জবাই দিয়ে কীভাবে ইসলাম এবং আল্লাহকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন, আমি ঠিক জানি না।

একবার নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিজবুত তাহরির সদস্য কয়েকজন ছেলে আমাকে ধর্মীয় বয়ান দিতে এসেছিল। আমাকে ধর্মবয়ান দিতে আসা লোকজন অধিকাংশ সময়ই বিধ্বস্ত অবস্থায় পালিয়ে যায়, তারাও পালিয়েছিল। এরপরে তারা তাদের দলের নেতাদেরকেও নিয়ে এসেছিল, তারাও মোটামুটি মুখ কালো করে বিদায় নিয়েছিল। এরকম তর্ক যুদ্ধ বেশ কয়েকবারই হয়েছে, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে আমি তাদের সাথে বেশ কয়েকবার তর্ক করেছি। আমি দেখেছি, তারা প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখায় বেশ ভালো সিজিপি-র অধিকারী হলেও তারা রীতিমত জাংকহেড ফার্মের মুরগি, বাবা মা পড়ালেখা ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর দিতে দেয়নি বলে ধর্ম দিয়ে তাদের মগজ ধোলাই খুব সহজ কাজ।

আমার ভাগিনা নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট সেখানে জমা দিলে নিয়ম অনুসারে ফুল স্কলারশিপ পাওয়া যায়। একজন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য এইটুকু মোটেও বেশি কিছু না, বরঞ্চ তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে একটু সম্মান জানানো। রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কিছু দিতে পারিনি, যেখানে রাজাকারদের গাড়িতে পতাকা উড়েছে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা থেকে গেছে বঞ্চিত, অবহেলিত।

মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সময় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ ফাইন্যান্সিয়াল এইড সার্টিফিকেট দেখে নাক কুঁচকে বলেছিল, 'তোমাদের তো পড়ালেখা করারই প্রয়োজন নাই। বাপে কবে কী না কী করে গেছে, সেই সার্টিফিকেট বেচেই তোমাদের চলে যাবে। সরকার তো তোমাদের জন্যেই বসে আছে, কোনোমতে পাশ দিলেই চাকরি। অন্যরা কষ্ট করবে আর তোমরা বাসায় বসে বসে আরাম করবা।' এছাড়াও নানা ধরনের রসাত্মক বক্তব্য দিয়েছিল, যা শুনে আমার ভাগিনা রাগে দুঃখে বেশ কয়েকদিন কারো সাথে কথাই বলে নাই।

এরপরে ভাগিনাকে দীর্ঘদিন তাদের অফিসে তার মুক্তিযোদ্ধা পিতাকে নিয়ে ঘুরতে হয়েছে, বেশ কয়েকমাস তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। তার অপরাধ ছিল, সে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারেই সে আবেদন করেছিল। সে জানত না, কাগজে কলমে অনেক কিছুই লেখা থাকে, সেগুলো বাস্তবে থাকে না। নানা টেবিলে ঘুরে ঘুরে নানা জনার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে, তার বাবা আসলেই মুক্তিযুদ্ধ করেছে কী না, অথবা মুক্তিযুদ্ধ করে থাকলেই বা কী? দেশের এমন কী উন্নতি হয়েছে? পাকিস্তান আমলেই তো অনেক ভালো ছিল। অথবা ভারতের চক্রান্তে দেশ ভাগ হয়ে গেল, তৌহীদী মুসলিমদের দেশকে দুই ভাগ করে ফেলা হল, কী আপশোশ কী আপশোশ!

যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এই ধরনের লোকজন থাকে, যাদের এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সামান্যতম সম্মান বোধটুকু নেই, তারা কীভাবে একটা প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয় তা আমার জানা নেই। আর এই সমস্ত শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্তরা যদি ধর্ম অবমাননার কারণে মানুষ জবাই শুরু করে, তাহলে কাকে কী বলব?

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বেশ কয়েকটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শিক্ষক হিজবুত তাহরিরের সক্রিয় সদস্য। শিবিরও প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলে ঢালাও ভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মৌলবাদী বা হিজু বা শিবির বানানো উচিত না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জড়িয়ে এই ধরণের ট্যাগিং অত্যন্ত আপত্তিকর। কিন্তু কিছু বিষয় অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাউকে নেওয়ার আগে অবশ্যই যাচাই করা উচিত, ওই লোকটি জামাত শিবির কিংবা হিজবুত কিংবা অন্য কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত কিনা। সেরকম হলে তাদের নিষিদ্ধ করাই জরুরি, কারণ একজন শিক্ষক পড়ালেখায় হয়তো খুব ভালো সিজিপিধারী, কিন্তু সে ভেতরে ভেতরে মৌলবাদী চিন্তার ধারক বাহক হতে পারে। এবং তার হাত ধরে যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে কয়েকজন মৌলবাদে দীক্ষা নেবেই। একই ভাবে, এখনকার বাবা-মাও তাঁদের সন্তানকে এমন ভাবে গড়ে তোলেন যে, পড়ালেখা ছাড়া ছেলেমেয়েরা অন্য কোনো কাজে মনোযোগই দেয় না। ছেলেমেয়েরা ইতিহাস জানে না, বিজ্ঞান জানে না, সাহিত্য বোঝে না, তারা খালি বোঝে পড়ালেখা আর সিজিপি। সেই ছেলেটি যখন নামাজ রোজা শুরু করে, অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মা তাতে খুশি হয়। তাঁরা হয়তো জানেনও না ছেলে কোন পথে যাচ্ছে।

জামাত ইসলামি সহ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা, যারা কিনা সারাজীবন মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে, ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা পক্ষে আন্দোলন করেছে, দরিদ্র শিবির কর্মীদের উস্কানি দিয়েছে, মাঠে নামিয়ে দিয়ে পুলিশের গুলি খেতে বাধ্য করেছে, তাদের ছেলেপিলেরা কখনই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী হয় না। তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয়, তারা প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। আর শিবিরের মিছিলে পুলিশ পিটিয়ে মারার সময় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় সেই দরিদ্র শিবির কর্মীটি, যে হলে সিট পাবার, ইসলামি ব্যাংকে চাকরি পাবার আশায় শিবিরের

মিছিলে যোগ দিয়েছিল। এখন জামাত শিবির হিজবুত তাহরির দরিদ্র ছেলেদের সাথে সাথে ধনী পরিবারের ছেলেদের দিকেও তাদের কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে! আর এর জন্য সেই সব বাবা-মারও দায় অস্বীকার করা যায় না, যাঁরা ছেলেমেয়েদের উৎকৃষ্ট মানের নির্বোধ মাথামোটা ফার্মের মুরগিতে পরিণত করে কর্পোরেট দুনিয়ার একটি প্রোডাক্টে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন।

বিষবৃক্ষের শেকড় উপড়ে না ফেললে বিষাক্ত ফল জন্মাতেই থাকবে। একটা একটা ফল কেটে দিয়ে লাভ হবে না, কারণ গোড়ায় পানি ঢালা হচ্ছে, সার দেওয়া হচ্ছে, একটি ফল কেটে দিলে দশটি জন্মাবে।

আমি জানি না কাল আমার ওপরে আবারও আক্রমণ আসবে কিনা। জামাত শিবিরের হিটলিস্টেড ব্লগারদের মধ্যে আমার নাম সবগুলো হিটলিস্টেই রয়েছে, আমাকে তারা হত্যা করতেই পারে। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'এখনো বিষের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়নি, তুমি কথা বলো!' আর তাই কথা বলে যেতেই হবে, লিখে যেতেই হবে।

মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা। তাই মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করার সাহস আমার আছে বলেই মনে করি। ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে গত কয়েকবছর ধরেই লিখে যাচ্ছি অবিরাম, এই যুদ্ধে অনেক প্রিয় বন্ধু পেয়েছি, অনেক শত্রুও তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আদর্শগত শত্রু, ব্যক্তিগত শত্রু থেকে শুরু করে অনেক মানুষের প্রতিহিংসার শিকার হওয়াটাও আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সমালোচনাকে গ্রহণ করি, প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতাকে সম্মান করি বিধায় ফেসবুক-ব্লগে জামাত শিবির হিজবুত তাহরির থেকে শুরু করে আমাকে গালিদাতা এবং মৃত্যু হুমকিদাতাদেরকেও ব্লক করি না। কারণ আমি মনে করি মানুষের চিন্তাশীলতার দরজাগুলো কখনো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। এমনকী আমাকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল, আমাকে যারা নানাভাবে আক্রমণ করেছে, তাদের প্রতিও আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কারণ তারা জানে না তারা কী করছে। তাদেরকে এভাবেই শেখানো হয়েছে, মগজ ধোলাই করা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং মগজধোলাইয়ের প্রক্রিয়া যেদিন বন্ধ হবে, সেদিনই আমি ভাবব আমার ওপরে আক্রমণের বিচার হয়েছে।

এই যুদ্ধে কতক্ষণ টিকে থাকব জানি না। কিন্তু একটাই অনুরোধ থাকবে, মৃত্যুর পরে অনুগ্রহ করে আমাকে ধর্ম অন্ত প্রাণ অথবা প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল বলে প্রচার প্রচারণা কেউ চালাবেন না। আমি আমার পুরোটা জীবন ব্যয় করেছি এসবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, মৃত্যুর পরে আমি সেগুলোর কাছে পরাজিত হতে চাই না।

আমি চাই না আমার কোনো জানাজা হোক। আমার জানাজার হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি বরঞ্চ আমাকে আরো ছোটো করে ফেলবে। আমি জাতীয় বীর হতে চাইনি, জনপ্রিয় হবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি আমার নিজের নীতি আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছি এবং সেগুলো নিয়েই মৃত্যুবরণ করতে চাই। আমি যেমন, আমি সেটাই; দোষেগুণে পরিপূর্ণ একজন সাধারণ মানুষ, যে চিন্তা করতে শিখেছে। বাড়তি বিশেষণ বা নানা ধরনের শব্দ ব্যবহার করে আমার মৃত্যুর পরে আমাকে মহান বানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মরদেহ কোনো মেডিকেল কলেজে দেওয়া হবে, আমার চোখ থেকে শুরু করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। আমার চোখ দিয়ে আরেকজন অন্ধ মানুষ পৃথিবীর রঙ রূপ দেখবে, এর চাইতে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আমার কিডনি থেকে শুরু করে যা কিছুই ব্যবহার যোগ্য হবে, সেগুলো কোনো অসুস্থ মানুষকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমার বাকি শরীরটা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ে গবেষণা করবে, যেন তারা মানবদেহ এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী নই, এই পৃথিবীই আমার সবকিছু, এই দেশের মাটিই আমার ঠিকানা। যেই যুদ্ধ শুরু করেছিলাম আমরা সবাই মিলে, সেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। জয় আমাদের হবেই।

জয় বাঙলা। মানুষের চেতনার মুক্তি ঘটুক, মানুষের জয় হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

নাস্তিকরাই কেন বার বার

ফারহানা আহমেদ

৯ মার্চ 'মুক্তমনা' ব্লগে লেখকের এই লেখা (পোস্ট) প্রকাশিত হয়।

আসিফ মহিউদ্দিন ছুরিকাহত হলেন, আমরা বললাম ছবির হার্টের গণ্ডগোল এর কারণ হতে পারে, এ নিছক ব্যক্তিগত শত্রুতা, ওর বন্ধুদের কেউ এই কাজ করে থাকতে পারে। আর তাছাড়া, আসিফ ছেলেটা খালি 'আমি আমি' করে, ওকে তো ইচ্ছা হয় আমিই ধরে মারি, যে মেরেছে তার আর দোষ কী? এরপর, 'থাবা বাবা' রাজীবের পালা, আমাদের মনে হল ওই 'কুৎসিত' লেখাগুলো না লিখলেই পারতেন, ওইসব পড়ে আমারই তো কুৎসিত লেগেছে, ছিঃ! এরপর, সানিউর রহমান ওরফে নাস্তিক নবী, তার কাজকারবার তো আরও ভয়াবহ, আর তাছাড়া সে তো ব্লগার না, কোনো কালে বোধহয় ছিলেন, কিন্তু এখন তো আর নেই, সো, তার দায় আমরা নেব কেন? মোটাদাগে এই হল, ফেসবুক-ব্লগে যাদের মোটামুটি প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজন হিসেবে জানতাম তাদের প্রতিক্রিয়ার সারমর্ম। আমাকে বিষয়টা একদিকে যেমন ব্যথিত করেছে, তেমনি একটা প্রশ্নও মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, একের পর এক ধর্মে অবিশ্বাসী ব্লগার-অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরাই কেন আক্রান্ত হচ্ছেন? জামাত-শিবির চক্রের বিরুদ্ধে তো আসিফ-রাজীব-সামিউরের চেয়ে অনেক বেশি সোচ্চার আস্তিক ব্লগাররা আছেন। এই ব্লগাররা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখত, জামাতের বিরুদ্ধে লিখত, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করত ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখিতে। তাহলে বেছে বেছে এরাই কেন?

আমার মনে হয়, এই রকম ঘটার পেছনে দুটো বিষয় কাজ করছে। প্রথমটা অনেকটা তাত্ত্বিক, নাস্তিকদের নিয়ে ধর্মব্যবসায়ী বা অ-ব্যবসায়ী দু-শ্রেণীর এস্টাব্লিশমেন্টের পক্ষের লোকজনের মনে সন্দেহ ব্যাপক। এস্টাব্লিশমেন্টের স্তম্ভগুলোর মধ্যে ধর্ম অন্যতম শক্তিশালী

মাধ্যম, কখনো কখনো তা রাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী, রাষ্ট্রকেই ধর্মের মদত নিতে হয়। এস্টাব্লিশমেন্টের অন্য স্তম্ভগুলোও ধসে পড়ার উপক্রম হলে মদত মাঙ্গে ধর্মের। এস্টাব্লিশমেন্টের পক্ষে কাজ করার জন্য ধর্মের সবথেকে বড়ো সুবিধা হল এর অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা। বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া, অতিপ্রাকৃত শক্তির ভয়ে ভীত করে রাখা — এইসব অস্ত্র ব্যবহার করে ধর্ম তার কার্য হাসিল করে। নারী পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠলে, ধর্মই তাকে ঠান্ডা করে; মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক যেতে পারে না, কারণ আল্লা যাকে এই জামানায় কিছু দেননি, আখেরাত তো তারই জন্য। রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সহজ ব্যবহার্য অস্ত্র হল ধর্ম, বাংলাদেশেই দেখি আমাদের পতিত স্বৈরাচারী ক্ষমতায় থাকার জন্য রাষ্ট্রধর্মের এমনই ক্লস (ধারা) সংবিধানে যুক্ত করেছেন, যা থেকে বের হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে কবে সম্ভব হবে কেউ জানে না।

এহেন মহাপরাক্রমশালী হাজার বছরের চেষ্টায় নির্মিত ধর্ম নিয়ে যারা প্রশ্ন করতে শুরু করে, পরকালের ভয়ংকর শাস্তির ভয় যাদের মনে কাঁপন ধরাতে পারে না, তাদের সন্দেহ করাটা এবং কিছুটা ভয় পাওয়াটা এস্টাব্লিশমেন্টের পক্ষে অসম্ভব নয়। এমনকী, এস্টাব্লিশমেন্টের পক্ষের যে সব তুলনামূলক লিবারেল ফোর্স আছে তারাও নাস্তিকদের সন্দেহের চোখে দেখে; শেখ হাসিনা বা আওয়ামি লিগ নাস্তিকদের পক্ষে কথা শুধু যে রাজনৈতিক কারণে বলেন না তা নয়, তাঁরা নিজেরাও এদের ঠিক বিশ্বাস করেন না। করার কারণও নেই। আস্তিক লোকজনের সবসময় একটা সুবিধা থাকে, যে কোনো বিষয়ে আপোষ করে নেওয়া যায় ধর্মের নামে, কেউ কিচ্ছু মনে করে না। নাস্তিকের সেই সুবিধাটা নেই, তাকে নিজের কাছেই প্রতিনিয়ত জবাব দিতে হয় আমি যে পক্ষে আছি, কেন আছি? কোন যুক্তিতে? তার মনের গঠনটা এইরকম না হলে তার পক্ষে আসলে ঈশ্বরকে নিয়েও প্রশ্ন করা সম্ভব হত না। নারী প্রশ্নে, মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে নাস্তিকের অবস্থান তাই অনেক পরিষ্কার, অনেক র‍্যাডিক্যাল, অনেক প্রগতিশীল। আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনও নাস্তিক পাইনি, যিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, বা নারীদের প্যাকেটে মুড়ে রাখতে চান। নাস্তিকের এই র‍্যাডিক্যাল আপোষহীন চরিত্রই তাকে মধ্যমপন্থী লোকজনের কাছে অপ্রিয় করেছে।

দ্বিতীয় দিকটা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত। আমি শুরু করেছিলাম অনলাইনে পড়া কিছু প্রতিক্রিয়া দিয়ে। হ্যাঁ, মোটাদাগে এই রকম প্রতিক্রিয়াই দেখেছি গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে। নাস্তিক মরলে বা মার খেলে তার প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন আন্দোলনের সহযোদ্ধারা তাতে করে নাস্তিকরা জামাত–শিবির–হিযবুতের সবথেকে সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রমাণ করে কেউ যদি নিহত বা আহত হন এবং তাঁর একই সাথে অনলাইনে ধর্ম নিয়ে লেখালেখি করার অভ্যাস থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি হবে না, হলেও কম হবে। বিশ্বাসের জায়গা থেকে হোক, বা শাহবাগ আন্দোলনকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর কাছে প্রিয় রাখার জায়গা থেকেই হোক, বা নিজের প্রাণের ভয়েই হোক, আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ধর্মীয় মৌলবাদ সংক্রান্ত আলোচনার জায়গাটা বাদ দিয়েই জামাত–শিবির নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছেন। তাই নাস্তিকদের সাথে কোনো রকম সংশ্রবও তাঁরা অস্বীকার করছেন। হয়তো, এটাই সময়ের দাবি, এভাবে না হলে জামাত–শিবির কুৎসা রটানোর আরও কিছু অস্ত্র পেয়ে যেত। কিন্তু, ব্যক্তিগত জীবনে একজন ধর্মহীন লোক এবং একইসাথে শাহবাগের গণজাগরণের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে আমার কষ্টই লাগে যখন দেখি ইমরান এইচ সরকার মাইকে উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কোনো নাস্তিক আছেন?' এবং উপস্থিত জনতা সমস্বরে আওয়াজ তোলে, 'না, না।'

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির রাজনীতি

অনামিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের দায়ে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'–র বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতার গ্রেপ্তারি, বিচার এবং তিনজনের শাস্তির আদেশ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এবং শাহবাগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এক দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এই প্রতিবাদের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি' দলটি। শুধু বাংলাদেশেই নয়, অন্য দেশ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এর সমর্থনে যে সংগঠিত কর্মসূচি দেখা গেছে, সেখানেও 'জামায়াতে ইসলামি হিন্দ'–এর সক্রিয় ভূমিকা সকলেরই চোখে পড়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এক বড়ো অংশের মানুষ জামায়াতে ইসলামি এবং তার রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত নয়। ইসলামকে আমরা জানি একটা ধর্ম হিসেবে, রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই।

বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি' সর্ববৃহৎ ইসলামি রাজনৈতিক দল। এছাড়া আরও ২৪টি ইসলামি রাজনৈতিক দল সেখানে রয়েছে, যারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়। এছাড়াও রয়েছে শতাধিক ইসলামি দল ও গোষ্ঠী, যাদের রাজনীতি ছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও সামরিক ভূমিকা।[২] আমরা এই প্রবন্ধের পরিসরে আপাতত 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'–র রাজনীতি নিয়েই কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করব। এই কাজে আমরা প্রথমত ও প্রধানত জামায়াতে ইসলামির নিজস্ব দলিলপত্র থেকেই একটা ধারণা পেতে চাইব। হাতের কাছে আমরা পাচ্ছি, 'জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ' প্রকাশিত আব্বাস আলী খানের লেখা বই 'জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস'–এর ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত

[২] **সম্পাদকের নোট** : ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে যখন ইসলামি দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় এবং ১৯৭৭ সালে যখন এই মর্মে সংবিধান সংশোধন করা হয়, তার পরে বহু ইসলামি সংগঠন ও দলের জন্ম হয়। বাংলাদেশ গঠনের আগে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ১১টি ইসলামি দল তথা সংগঠন। সূত্র : বাংলাদেশ ইন্টালিজেন্স, দ্য ডেলি স্টার ২৯ আগস্ট ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত শাখাওয়াত লিটনের প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ। এছাড়া রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কিছু লেখার বাংলা তরজমা। ২০০৮ সালে 'জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ' নাম পরিবর্তন করে হয় 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পরিচয়

'জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস' থেকে আমরা জানতে পারছি, 'সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধ্বমুখী বংশ পরম্পরা হযরত নকীর (রঃ) মাধ্যমে নবী মুস্তাফার (সঃ) কলিজার টুকরো, হজরত ইমাম হুসাইন শহিদ (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পিতা-পিতামহ ও পূর্বপুরুষগণের সকলেই ইসলামি দাওয়াত ও তাবলিগ এবং দ্বীনী[৩] শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি কাজেই জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত খাজা কুতবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী (রঃ) ভারতীয় চিশ্‌তিয়া তরিকার পীরগণের আদি পীর ছিলেন। তাঁর নামেই মওদূদী খান্দানের উদ্ভব হয়েছে। সাইয়েদ আবুল মওদূদী ঊর্ধতন বাইশ পুরুষ সকলেই কুতবুদ্দিন মওদূদ চিশ্‌তীর নামানুসারে নিজেদেরকে মওদূদী নামে অভিহিত করেন।'

১৯০৩ সালে হায়দ্রাবাদের আওরঙ্গাবাদ শহরে মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ আহমদ মওদূদী ছিলেন একজন 'আবেদ ও পরহেযগার বুযুর্গ'। তিনি আদর্শ পিতা হিসেবে পুত্র মওদূদীকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন।। সে সময় আল্লামা শিবলী নোমানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ ও আওরঙ্গাবাদে এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ, কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, মানতেক প্রভৃতি পড়ানো হত। এ মানের ম্যাট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রি কলেজকে দারুল উলুম বলা হত।

চোদ্দো বছর বয়সে মৌলভী বা ম্যাট্রিক পাশ করার পর তাঁকে হায়দ্রাবাদের দারুল উলুমে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু পিতার অসুস্থতার জন্য তাঁকে পড়াশুনা ছেড়ে ভূপালে যেতে হয়। ১৯২০ সালে পিতার ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁকে পিতার খেদমত করতে হয়। ফলে পড়াশুনা অসমাপ্ত রয়ে যায়। সতেরো বছর বয়সে মওদূদী সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে জব্বলপুরে 'তাজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। সেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে দিল্লি গিয়ে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর মুখপত্র 'মুসলিম' এওবং পরবর্তীকালে 'আল-জমিয়ত'-এর সম্পাদনা করেন। সাত-আট বছর দিল্লি থাকাকালীন মওদূদী আরবি ভাষা ও হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতিতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তেইশ বছর বয়সে পত্রিকার সম্পাদক মওদূদী ইসলামি জিহাদের ওপর 'আল-জিহাদু ফিল্ ইসলাম' নামে একটি বই লেখেন। এছাড়া তার আগেই আল-জমিয়তের পাতায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত 'ইসলাম কা সারচাশমায়ে কুওয়াত' নামে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর সারা জীবনে তিনি বহু লেখা লিখেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের তরজমা করেছেন।

১৯২৮ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তারা কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। মওদূদী কংগ্রেসের একজাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির সঙ্গে কোনোদিনই একমত হতে পারেননি। তিনি আল-জমিয়তের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করেন। এইসময় হায়দ্রাবাদের উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তাঁর বড়ো ভাই তাঁকে মাসিক আটশো টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে বলেন। মওদূদী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভাইজান! অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। আমি দেখছি, যে প্লাবন আসছে তা ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের বিপ্লবের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক। এ বিপদ সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য। ...'

গড়ে উঠল রাজনৈতিক ইসলামের এক নতুন পরিসর

'জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস' থেকে আমরা জানতে পারছি, '১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে অজ্ঞ, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার এক অভিযান শুরু করেন। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনৈক মুসলমান শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করেন। ফলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা যেখানে-সেখানে মুসলিম বস্তিসমূহ আক্রান্ত হতে থাকে। হিন্দু নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সকল দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও ইসলামি জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার দ্বারা ভারতের সর্বত্র চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকেন। স্বয়ং মিঃ গান্ধীও এ অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেন। এসব অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আলেম সমাজের। কিন্তু তৎকালে আলেমগণের একমাত্র সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে।'

১৯৩১ সালে মওদূদী হায়দ্রাবাদে 'তর্জমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯৩২ সালের গোড়ায় তিনি এই পত্রিকার মালিকানা খরিদ করে ইসলামি আন্দোলনের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যান।

'জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস' বলছে, '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে সারা ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ভৌগোলিক একজাতীয়তার ভিত্তিতে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ভারতের ভবিষ্যত ক্ষমতা হস্তান্তরের কী ভয়াবহ ও বিষময় ফল হতে পারে, তারই বাস্তব প্রমাণ পেশ করল এই কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলো। এ প্রদেশগুলোতে (বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বে) মুসলমানদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেড়ে যায়, গান্ধীর ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমানদের গোলাম জাতিতে পরিণত করার অপপ্রয়াস চলতে থাকে। দৃশ্যত এ প্রদেশগুলোতে হিন্দু রামরাজত্ব কায়েম হয়।' মওদূদী বুঝতে পারেন, 'গণসংযোগের (Mass Contact Movement) মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপন এতটা বদলে দেবে যে, দু-এক পুরুষের মধ্যে ভারতে ইসলাম এতটা অপরিচিত হয়ে পড়বে যতটা জাপান অথবা আমেরিকায় অপরিচিত রয়েছে এবং এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না।'

---

[3] **আরবি ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ প্রভুত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও কর্মফল এবং চতুর্থ অর্থ পথ, পন্থা, ব্যবস্থা ও আইন — মওদূদী।**

১৯৩৮ সালের ১৬ মার্চ মওদূদী হায়দ্রাবাদ ছেড়ে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোটে হিজরত করেন। এখানে জামালপুর নামক এক নিভৃত পল্লিতে এসে তিনি 'দারুল ইসলাম' নামে এক প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংস্কার–সংশোধন, তালিম–তরবিয়ত ও সংগঠনের ফরমুলা তৈরি হয়েছিল। মওদূদী বলেছিলেন, দারুল ইসলাম হল, মুসলমান পরিবার প্রশিক্ষণ ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির কেন্দ্র ... এভাবে একটি পরিবারের সংস্কার–সংশোধন হয়ে গেলে সমগ্র জাতির সংস্কার–সংশোধন আপনা–আপনিই হয়ে যাবে।'

মওদূদী দেখলেন, একজাতীয়তার ফাঁদে আবদ্ধ করে মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করার ষড়যন্ত্র চলছে। দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপাত্র মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী দিল্লির জামে মসজিদ থেকে ফতোয়া জারি করলেন যে, হিন্দু–মুসলমান মিলে এক জাতি। বিপরীতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষিত অ–আলেম নেতৃবৃন্দ মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার জন্য 'রক্ষাকবচ' দাবি করলেন। মওদূদীর কাছে এটাও ছিল অর্থহীন। ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যানুপাত ছিল তিন ও এক। তাই তিনি মনে করতেন, কোনো রক্ষাকবচই মুসলমানদের জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেইসময় মওদূদী দেখলেন, 'অবস্থা যেদিকে চলছে তাতে একটা সংকট এটা হতে পারে যে, পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লিগ বিফল মনোরথ হবে এবং ইংরেজ ভারতে এক ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তা হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে। ... দ্বিতীয় অবস্থা এ হতে পারে যে, মুসলিম লিগের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কয়েক কোটি মুসলমান যে ভারতে রয়ে যাবে, তাদের কী দশা হবে এবং স্বয়ং পাকিস্তানে ইসলামের দশাটাই বা কী হবে?' এমতাবস্থায় মওদূদী ১৫০ জনের একটি তালিকা তৈরি করে লাহোরের পুঞ্চ রোডে মুবারক পার্কে তর্জুমানুল কুরআন কার্যালয়ে তাঁদের উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়াতনামা পাঠান। ২৫ আগস্ট ১৯৪১, সারা ভারত থেকে ৭৫ জন মর্দে মুমিন লাহোরে উপস্থিত হন। ২৬–২৮ আগস্ট সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় নতুন দল 'জামায়াতে ইসলামি হিন্দ'।

জামায়াতে ইসলামির বিশ্ব–প্রেক্ষিত

জন্মলগ্নেই মওদূদী বলেছিলেন, 'যারা জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করবে, তাদের প্রত্যেকের এ কথা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জামায়াতে ইসলামির সামনে যে কাজ রয়েছে তা যেমন–তেমন কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাকে বদলিয়ে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি–নৈতিকতা, রাজনীতি, সভ্যতা–সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি — প্রতিটি বস্তু পরিবর্তন করে দিতে হবে। খোদাদ্রোহিতার ওপরে যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম রয়েছে, তা বদলিয়ে তা খোদার আনুগত্যের ওপরে কায়েম করতে হবে। এ কাজে সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে প্রত্যেককে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, সে কোন কষ্টময় পথে পা বাড়াচ্ছে।'

দল বা জামায়েত গঠন করার পর ভারতীয় মুসলমানেরা পাকিস্তান দাবির পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু জামায়েতিরা দেখতে পেল, 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র হলেই যে তা ইসলামি রাষ্ট্র হবে তার নিশ্চয়তা নেই, বরঞ্চ মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলমানদের যে রাষ্ট্র হবে তা একটি কাফের রাষ্ট্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হতে পারে। মিশর, তুরস্ক, ইরাক, লিবিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, লিবিয়া, আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' তাই দেশ ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়ে যখন ভারত ও পাকিস্তান দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল, 'জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানকে তার শাসকদের অভিলাষ অনুযায়ী যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মহীন (সেকুলার) রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধাদান করে আসছে, তেমনি ভারতের হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে টিকে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ দলটি একটি চরিত্রবান কর্মীবাহিনী সহ যদি বিদ্যমান না থাকত, তাহলে একদিকে যেমন ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হত, অন্যদিকে পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হত।' এই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের রাজনীতি সম্পর্কে জামায়েতে ইসলামির মূল্যায়ন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 'সেকুলার' শব্দের অর্থ জামায়েত করেছিল 'ধর্মহীন', 'ধর্মনিরপেক্ষ' নয়। এর মধ্যেও তাদের রাজনৈতিক মনোভাবের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্ম বা দ্বীন (ধর্মীয় নৈতিকতা সহ) তাদের কাছে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন–বিধান, যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই, যা দ্বীনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অতএব রাজনীতি অবশ্যই এই দ্বীনেরই একটা অংশ।

পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, জম্মু ও কাশ্মীরে তাদের স্বতন্ত্র সাংগঠনিক তৎপরতা জারি রেখেছে। আপাতত আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বাংলাদেশের দিকেই।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির রাজনীতি

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর জামায়াতে ইসলামি দুভাগে বিভক্ত হয় — জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামি হিন্দ। উভয় দেশের জামায়াতের আমীর ও তাদের পৃথক কর্মসূচি আগাম ঘোষিত হয়। নিখিল ভারত জামায়াতের রুকন (সদস্য) সংখ্যা ছিল ৬২৫। এর মধ্যে ২৪০ জন ভারতে রয়ে যান এবং ৩৮৫ জন পাকিস্তানে কাজ শুরু করেন। জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানের আমীর হিসেবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোরের ইছরায় আসেন এবং সেখানেই এই দলের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি সংবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে জামায়াত এবং মওদূদীকেও তিনবার হাজতবাস করতে হয়। এমনকী তাঁকে একবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জনসমর্থনের চাপে পাকিস্তান সরকার সেই আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৫৮ সালের সামরিক সরকার জামায়াতে ইসলামিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১৯৭১ সালে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, মওদূদী জামায়াতের নেতা হিসেবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নেন। অনেক আগেই মওদূদী বলেছিলেন, 'ইসলামি জাতীয়তা গঠনে বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণের কোনোই অংশ নেই।' ১৯৬৪ সালে যখন পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সাময়িকভাবে জামায়াতে ইসলামির কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তখন গ্রেপ্তার হন মওদূদী সহ ৬০ জন জামায়াতে নেতা। এদের মধ্যে ছিলেন গোলাম আযম (আমীর) সহ পূর্ব পাকিস্তানের ১৩ জন জামায়াতে নেতা। গোলাম আযম শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেননি। তিনি তাঁর দলকে নিয়ে পাকিস্তানের

সেনাবাহিনীর পক্ষে রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌ ইত্যাদি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩০ জুন লাহোরে সাংবাদিকদের কাছে গোলাম আযম বলেছিলেন, 'আমার দল পূর্ব পাকিস্তানে দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এ কারণেই দুষ্কৃতকারীদের হাতে বহু জামায়াত কর্মী নিহত হয়েছে।' পরে ১৯৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামায়াতকে মনে করত পহেলা নম্বরের দুশমন। তারা তালিকা তৈরি করেছে এবং জামায়াতের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করছে, তাদের বাড়িঘর লুট করছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও জামায়াত কর্মীরা রাজাকারে ভর্তি হয়ে দেশের প্রতিরক্ষায় বাধ্য। কেননা তারা জানে 'বাংলাদেশ'-এ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো স্থান হতে পারে না। জামায়াত কর্মীরা শহিদ হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না।'

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের সরকার জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর প্রথম সারির নেতারা (পশ্চিম) পাকিস্তানে চলে যান। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান গোলাম আযম সহ ৩৯ জন রাজনৈতিক নেতার নাগরিকত্ব খারিজ করেন। তিনি চলে যান লন্ডনে। ১৯৭৫ সালে মুজিবরকে হত্যা করা হল এবং সেনাপ্রধান মেজর জিয়াউর রহমান সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। গোলাম আযম জামায়াতের নেতা হিসেবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ফের শুরু হয় 'জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ' নামে। ২০০৮ সালে নাম পরিবর্তন হয় 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'। ২০১২ সালে এই দল নিজেদের আইনি স্বীকৃতি বাঁচাতে দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধন করে এবং ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে।

বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা ছিল 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ গঠন করবার বা তার সদস্য হবার বা অন্য কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না।'

তবে ১৯৭৭ সালে আনা পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়, 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।'

এছাড়া ১৯৭২-এর সংবিধানে ১২ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নে জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) বিশেষ কোনো ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে'। পঞ্চম সংশোধনীতে এই অনুচ্ছেদটি বাতিল ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে জনগণের জাতীয় পরিচিতির ব্যাপারে বলা ছিল 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেন।' তবে ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীতে এই অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবে।'

১৯৮২ সালে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয় এবং তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামায়াত নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ১৯৮২ সালের সেনা অভ্যুত্থানের পর জেনারেল হুসেইন মহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যকলাপ আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। সামরিক আইনের অধীনে থাকাকালীন ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত আওয়ামি লিগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। ১৯৯০ সালে আওয়ামি লিগ, বিএনপি এবং বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে জামায়াত এক অভ্যুত্থানে যোগ দেয়, এরশাদ জমানার পতন হয়। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১২% ভোট পেয়ে রেকর্ড ১৮টি আসন লাভ করে। তাদের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। এরপর এই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তার জমায়েতে আওয়ামি লিগের সঙ্গে যোগ দেয় জামায়াত। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির কাছে জামায়াত দুটি শর্ত পেশ করে : ১। আল বদরের পূর্বতন প্রধান মতিয়ুর রহমান নিজামীকে একটা যথাযোগ্য সরকারি পদ দিতে হবে; ২। জামায়াতের দ্বিতীয় প্রধান নেতা আলি আহসান মুজাহিদকে সোসাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী করতে হবে। এই সোসাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রকের মাধ্যমেই বাংলাদেশের বিপুল এনজিও সেক্টর এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ দেখভাল করা হয়। বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে তারা ৪% ভোট পায় এবং ১৭টি আসন লাভ করে। দলের দুই শীর্ষ নেতা মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে তারা ৪% ভোট পায় এবং ২টি মাত্র আসন লাভ করে।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে এতে অভিযুক্ত করে আটক করা হয়েছে গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আবদুস সোবহান, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, আলি আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আবদুল আলীম (জামিনে মুক্ত), আব্দুল কাদের মোল্লা, এ টি এম আযহারুল ইসলাম, মীর কাসেম মোল্লাকে। তবে আরেক অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদ পলাতক রয়েছেন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়েছে; বন্দি আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে।[৪]

---

[4] **সম্পাদকের** নোট : বিএনপি-র রাজত্ব কালে (১৯৭৫-৮১, ১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-২০০৬) বাংলাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ১৯৯২ সালের ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘটিত উস্কানিমূলক দাঙ্গা এবং ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয় বিএনপি ও জামায়াত ইসলামিকে। ২০১২ সালে কক্সবাজারে রামুর বৌদ্ধ পল্লিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর যে ন্যাক্কারজনক হামলা, বাড়িঘর ও বুদ্ধ মন্দির পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছিল, তা সঙ্ঘটিত হয়েছিল জামায়াত ইসলামির ইন্ধনেই। জামায়াত ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বার বার আঘাত করেছে।

জামায়াত ইসলামি গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে গড়ে তুলেছে ব্যাংক, বীমা,

ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, হসপিটাল, ক্লিনিক ইত্যাদি। এইসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে অনেক জামায়াত নিয়ন্ত্রিত যুবকরা। জামায়াত ইসলামি আজ একটি প্রভাবশালী ও সংগঠিত রাজনৈতিক দল, কারণ তাদের রাজনৈতিক কর্মীরা খুবই সংগঠিত এবং অধিকাংশই তরুণ। দেখা যায় 'ইসলাম' এবং ইসলামিক নামধারী (যেমন, ইসলামি ব্যাংক, ইসলামিক ইনস্যুরেন্স, হজ্ব ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ ইত্যাদি) বিভিন্ন ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জামায়াতপন্থী লোকজনে ভরপুর। অনেক পরিচালক আছেন জামায়াতপন্থী। তারা কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও যুক্ত।

গ্রেফতার হওয়ার আগে গোলাম আযমের বক্তব্য

১১ জানুয়ারি ২০১২ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে হাজির হতে যাওয়ার পূর্বে গোলাম আযম দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বক্তব্য তার একান্ত সচিব নাজমুল হকের নিকট হস্তান্তর করে যান। 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'র ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত সেই বক্তব্যের কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে যে সেকুলার সরকার কায়েম হয়েছে, তারা আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের চরম বিরোধী। তাই তারা বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতিকে বেআইনি ঘোষণা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ জঘন্য উদ্দেশ্যেই ১৯৭৩ সালের মীমাংসিত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুর দোহাই দিয়ে জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাদের মনগড়া ট্রাইবুনালে এক জংলি আইনে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার চক্রান্ত করছে।

ওই আইন অনুযায়ী গঠিত তদন্ত সংস্থা আমার বিরুদ্ধে ৬২টি অভিযোগ এনেছে। জেলে নেওয়ার পর একতরফা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার বন্যা বইতে থাকবে। আমার কোনো বক্তব্য জনগণের নিকট পৌঁছাবার সামান্য সুযোগও থাকবে না। তাই গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথেই যাতে আমার বক্তব্য জনসাধারণ অবগত হতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই আমি আমার এ বক্তব্য পেশ করছি। সম্প্রতি কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল আমার সাক্ষাৎকার প্রচার করলেও যেহেতু সেগুলোতে আমার সকল বক্তব্য আসেনি, তাই এ ব্যবস্থা করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

২০১১ সালের নভেম্বরে আমার ৮৯ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। বার্ধক্যে রোগের অন্ত থাকে না। আমার ডান পায়ে সায়াটিকা ও বাম হাঁটুতে আর্থরাইটিস। এর জন্য দু-বেলা এমন কতক ব্যায়াম করতে হয়, যা অন্য কারো সাহায্য ছাড়া করা যায় না। একা চলাফেরা করতে পারি না। ডান হাতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাম হাত একজনের কাঁধে রেখে মসজিদে যেতে হয়। তাই অত্যাবশ্যক না হলে কোথাও যাই না। ব্লাডপ্রেসার সহ নানা অসুখের কারণে রোজ নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। এ অবস্থায়ও সরকার ৯০ বৎসর বয়সে আমাকে জেলে নিচ্ছে। আমি জীবনে চারবার জেলে গিয়েছি। জেল বা মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না। শহিদ হওয়ার জযবা নিয়েই ইসলামি আন্দোলনে শরিক হয়েছি। মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিলে শহিদ হওয়ার মর্যাদা পাব ইনশাআল্লাহ। এবার বার্ধক্যে ও অসুস্থতা নিয়ে বন্দিজীবন কেমন করে কাটবে সে ব্যাপারে মহান মাবুদের ওপর ভরসা করে আছি।

আপনারা অবহিত আছেন যে, ১১ বৎসর পূর্বে, ২০০০ সালে, আমি স্বেচ্ছায় জামায়াতে ইসলামির আমীর-এর পদ হতে অব্যাহতি নেওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক বিবৃতি দিই না। কিন্তু, বিগত কিছু দিন থেকে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও বানোয়াট খবর, কেবলমাত্র বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্লজ্জভাবে প্রচার করা হচ্ছে। তাই, সত্য প্রকাশের তাড়নায় আমি আপনাদের সামনে এ বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য হলাম।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি জন্মগতভাবে এ দেশের নাগরিক। ১৯২২ সালে ঢাকার লক্ষীবাজারে আমার নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করি। ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট ঢাকা থেকে পাস করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হই। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে পরপর দু-বছর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর জিএস (জেনারেল সেক্রেটারি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আমি ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদেরও জিএস ছিলাম। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খানের নিকট আমিই পেশ করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৪৮-৫০ সালে আমি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম এবং পরবর্তীতে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য আমি দু-বার কারাবরণ করি।

১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করি এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি। অখণ্ড পাকিস্তানে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমি সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। কপ (COP-Combined Opposition Party), পিডিএম (PDM-Pakistan Democratic Movement), ডাক (DAC-Democratic Action Committee) ইত্যাদি আন্দোলনে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্য সকল দলের নেতাদের সাথে অংশগ্রহণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। রাজনৈতিক কারণে ১৯৬৪ সালেও আমাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর আমি বিবৃতি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে কালবিলম্ব না করে বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানাই। এরপর আসে মার্চ ১৯৭১।

১৯৭১-এর মার্চ মাসের ওই উত্তাল দিনগুলোতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে শেখ সাহেবের আলোচনার সময় আমার সাথে শেখ সাহেবের একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও বর্তমান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের পিতা জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং জনাব আব্দুস সামাদ আযাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, অখন্ড পাকিস্তানের চিন্তা নিয়েই ওনারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। জনাব আব্দুস সামাদ আযাদের সাথে ২৫ মার্চেও আমার টেলিফোনে আলোচনা হয়। তিনি আমাকে পুনরায় আশ্বস্ত করে বলেন যে, তাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো

বিকল্প চিন্তা করছেন না।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায় তা থেকে বোঝা গেল যে, ইয়াহিয়া–মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেছে। পরে জানা গেল যে, ১৯৭০–এ নির্বাচিত আওয়ামি লিগ সদস্য ও আওয়ামি লিগ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু শেখ সাহেব পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। ইচ্ছা করলে তিনিও ভারতে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাননি। শেখ সাহেব গ্রেফতার হওয়ায় তাঁর কথা কিছুই জানা গেল না। অন্যদিকে বোঝা গেল যে, আওয়ামি লিগ নেতৃবৃন্দ ভারত সরকারের সহযোগিতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে চান। এদিকে, ১৯৭০–এর নির্বাচনে বিজয়ী নেতৃবৃন্দ ভারতে চলে যাওয়ায় অসহায় নির্যাতিত জনগণ আত্মরক্ষার জন্য দেশে অবস্থানরত আমাদের মতো রাজনৈতিক নেতাদের নিকটই ধরনা দিতে বাধ্য হল।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার এ দেশের সাথে যে আধিপত্যবাদী আচরণ করেছে তাতে আমাদের নিশ্চিত এ বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের সহযোগিতা নিয়ে দেশ স্বাধীন হলে তা ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রই হবে। তাই, কিছু বামপন্থী, সকল ডানপন্থী ও সকল ইসলামি দলগুলো সহ প্রায় সকল সুপরিচিত ইসলামি ব্যক্তিত্ব এ সুস্পষ্ট ধারণার কারণেই ভারতের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সঠিক মনে করেননি। ভারতের সাহায্য না নিয়ে যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ করা হত, তাহলে আমরা অবশ্যই সে যুদ্ধে যোগদান করতাম।

ভারত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭০–এ নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য জনাব নুরুল আমীনের বাসায় সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানাতে হবে এবং সেনাবাহিনীর জুলুম–নির্যাতনের শিকার অসহায় জনগণের সহায়তার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অনুযায়ী আমরা ৭/৮ জন একসাথেই টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করি। পিডিপি–র জনাব নূরুল আমীন, জামায়াতে ইসলামি থেকে আমি, নেজামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরিদ আহমদ, মুসলিম লীগের খাজা খায়রুদ্দীন, কেএসপি–র এ এস এম সুলাইমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাতে শামিল ছিলেন। এখন ওই মিটিঙের ছবির বরাত দিয়ে আমার নামে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ওনাদের কি ধারণা যে, ছবি কথা বলে? তাহলে শেখ সাহেবের সাথেও তো আমার এবং মাওলানা মওদূদী (র)–এর মিটিঙের ছবি আছে। সেগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল তা কি তারা বলতে পারবেন?

১৯৭১–এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারা রাজনৈতিক নেতাগণ জনগণকে জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী নেতৃবৃন্দ দেশে না থাকায় সাহায্যপ্রার্থী অসহায় জনগণের সমস্যার সমাধান করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব ও চেষ্টা ছিল। আমিও এ চেষ্টাই করেছি। আমি ১৪ আগস্ট ১৯৭১–এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের এক মিটিঙে সেনাবাহিনীর জুলুম–নির্যাতনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিকার দাবি করেছিলাম। বায়তুল মোকাররমের সামনে আরেকটি মিটিঙেও আমি এই প্রতিবাদ ও প্রতিকার দাবি উত্থাপন করেছিলাম। আমার বক্তব্য পত্রিকায় আসতে দেওয়া হয়নি; বক্তব্য প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্থপতি স্বয়ং যুদ্ধাপরাধী ইস্যুর চূড়ান্ত মীমাংসা করে গেছেন। শেখ সাহেবের সরকার তদন্তের মাধ্যমে পাক–সেনাবাহিনী ও সহযোগী অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে থেকে ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। তাদের বিচার করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই জাতীয় সংসদে International Crimes (Tribunals) Act পাস করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ–ভারত–পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে ওই যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করা হয়। শেখ সাহেব বাংলাদেশের কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় শামিল করেননি। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং যারা সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়েছিল, তাদেরকে শেখ সাহেবের সরকার 'কলাবরেটর' আখ্যা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের সামরিক সরকার সরকারি আদেশের মাধ্যমে জনগণ থেকে রাজাকার, আল–বদর, আশ–শামস নামে বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে।

এসব বাহিনীকেও শেখ সাহেব এর সরকার 'কলাবরেটর' আখ্যা দেন। 'কলাবরেটরদেও' বিচার করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'কলাবরেটর্স অর্ডার' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ আইনে বিচারের জন্য লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৪শো ৭১ জনের বিরুদ্ধে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬শো ২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী–প্রমাণের অভাবে কোনো মামলা দায়েরই সম্ভব হয়নি। মাত্র ২ হাজার ৮শো ৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭শো ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। পরবর্তীতে, ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর গ্রেফতারকৃত ও সাজাপ্রাপ্ত সকলেই মুক্তি পায়। অবশ্য যারা হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধে অপরাধী তাদেরকে ওই আইনে বিচার করার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু, এরপর দু–বছর পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে ওইসব অভিযোগে মামলা দায়ের না হওয়ায় এ আইনটিই বিলুপ্ত করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে সে সময় অভিযোগ উঠেনি, কোনো মামলা দায়ের হয়নি, সেই নিরপরাধীদেরকেই যুদ্ধাপরাধী সাজাবার জন্যে আজ মামলা তালাশ করা হচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধী ইস্যুর উদ্ভাবন

১৯৮০–র দশকে এবং ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে বিএনপি–র বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াত ও আওয়ামি লিগ যুগপৎ আন্দোলন করেছিল। সকল আন্দোলনকারী দলের লিয়াজোঁ কমিটি একত্রে বৈঠক করে কর্মসূচি ঠিক করত। তখন তো কোনো দিন আওয়ামি লিগ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী মনে করেনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১–এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য আওয়ামি লিগ জামায়াতের সহযোগিতা প্রার্থনা করে আমার নিকট ধরনা দিয়েছিল। আওয়ামি লিগের নেতা আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের মাধ্যমে আমাকে মন্ত্রী বানাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তখনও তো আওয়ামি লিগের মনে হয়নি যে, জামায়াতে ইসলামি যুদ্ধাপরাধী! পরবর্তীতে,

আওয়ামি লিগ মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী জামায়াতের সমর্থন লাভের আবদার নিয়ে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখনও তো তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ 'যুদ্ধাপরাধী' ছিল না। এরপর এমন কী ঘটল যে আওয়ামি লিগ ও কতক বাম দল জামায়াতকে 'যুদ্ধাপরাধী' আখ্যা দিয়ে জামায়াতকে নির্মূল করার জন্য জেহাদে নামলেন? এরূপ দু-মুখো নীতি কোনো সুস্থ রাজনীতির পরিচয় বহন করে না।

২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামি লিগ মাত্র ৫৮টি আসনে বিজয়ী হয় আর বিএনপি ১৯৭টি আসন পায়। জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন হওয়ায় নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলসমূহের শতকরা ২০ ভাগ ভোট একতরফা বিএনপি পাওয়ায় এসব ভোট থেকে বঞ্চিত হয়ে আওয়ামি লিগ মাত্র পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে বহু আসন হারায়।

আওয়ামি লিগ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার কারণ হিসেবে বুঝতে পেরেছিল যে, জামায়াতে ইসলামিকে ঘায়েল করতে না পারলে ভবিষ্যতে নির্বাচনে বিজয়ের কোনো আশা নেই। এ উপলব্ধি থেকেই ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে জামায়াত নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধীর অপবাদ দিয়ে আওয়ামি লিগ ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। যাদেরকে এক সময় 'কলাবরেটর' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকেই এখন আওয়ামি লিগ 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে বিচার করতে চাচ্ছে। ২০০১ সালের পূর্বে কখনো জামায়াত নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়নি। এখন পাকিস্তানী ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচার করার জন্য ১৯৭৩ সালে যে আইন করা হয়েছিল সে আইনেই আওয়ামি লিগ নতুনভাবে আমাদেরকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে বিচার করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর আগে আওয়ামি লিগ ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১, মোট দু-বার ক্ষমতায় ছিল। তখন তো তারা আমাদের এ আখ্যাও দেয়নি এবং ওই আইনে বিচারের উদ্যোগও নেয়নি। সেটা কেন নেয়নি এর কি কোনো সন্তোষজনক জবাব আওয়ামি লিগ জনগণের সামনে দিয়েছে বা দিতে পারবে?

এ বিচারের অসাধু উদ্দেশ্য

এ বিচারের অপচেষ্টার উদ্দেশ্য আসলে মোটেও সৎ নয়। হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই বিচারের নামে এ প্রহসন চলছে। জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করে যাতে আগামী নির্বাচনে জামায়াত আওয়ামি লিগের পরাজয়ের কারণ হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বিচার।

যুদ্ধাপরাধী ইস্যুর যে মীমাংসা শেখ সাহেব স্বয়ং করে গেছেন তা নাকচ করে নতুনভাবে বিচার করাই যদি আসল উদ্দেশ্য হত, তাহলে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার আগে করতে হত। কিন্তু সেটা সরকার করছে না। শেখ সাহেবের সমাপ্ত করা সে বিচার নাকচ না করেই অন্যায়ভাবে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতকে দুর্বল ও জামায়াত নেতৃবৃন্দকে দৃশ্যপট থেকে সরানোর জন্যেই নতুন করে যুদ্ধাপরাধ ইস্যু সৃষ্টি করেছে।

প্রহসনমূলক বিচার

এ মামলার বাদী বর্তমান সরকার। আসামীদের অপরাধের তদন্ত করার জন্য যে সংস্থা, তা এ সরকারই তাদের নিজেদের লোকদের সমন্বয়ে গঠন করেছে। ট্রাইবুনালের বিচারকদেরকেও এ সরকারই বাছাই করে নিজেদের পছন্দের লোকদের নিয়োগ দান করেছে। একদিকে আইনের দুর্বলতা, অন্যদিকে নিজেদের মনোনীত দলীয় লোকদের দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত ও বিচার। এ অবস্থায় ন্যায় বিচারের সামান্য সম্ভাবনাও থাকতে পারে না।

তদন্ত সংস্থা তাদের সাজানো লোকদেরকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সুযোগ দিচ্ছে। ওয়াকিবহাল ও নিরপেক্ষ সাক্ষ্যদাতাদেরকে পুলিশ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার কথাও জানা গেছে। এটা এক হাস্যকর তদন্ত প্রক্রিয়া। আসলে নিরপেক্ষ তদন্ত তারা করতে চায় না। সরকারের রায় হয়েই আছে। ওই রায়কে ঠিক রাখার জন্যে যে ধরনের তদন্ত দরকার সেটাই করা হচ্ছে। তাই, সরকারের পছন্দ মতো বিচার ও রায় ঘোষণা হবার আশঙ্কাই বেশি।

আমার সম্পর্কে তদন্তের নমুনা

তদন্ত সংস্থা কিছুদিন আগে আমার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। এতে একটি অভিযোগ আমার যে, আমি নাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গণহত্যার হুকুমদাতা। অথচ ১৯৭১ সালে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাইইনি। আরও অভিযোগ করেছে, আমার পরামর্শেই নাকি সামরিক সরকার রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটি গঠন করেছে। স্বাধীনতার পর আমি নাকি পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার বা রক্ষা কমিটি গঠন করেছিলাম। এর প্রমাণ তারা কোথায় পেল? আসলে তারা যা বলছে তাকেই তারা প্রমাণ বলতে চায়। এগুলো সবই অপবাদ, অভিযোগ নয়। তদন্ত সংস্থা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে এসবই সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যারা রাজনৈতিকভাবে আমাকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ তারাই নিজস্ব হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এ জঘন্য পন্থা বেছে নিয়েছে । আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করছি যে এসব অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। নিরপেক্ষ বিচার হলে এগুলোর একটিরও প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আমার সারা জীবনে আমি কখনো কোনো খারাপ কাজ করা তো দূরের কথা, কোনো খারাপ কাজের চিন্তাও আমার মাথায় আসেনি। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সহ এ দেশের সকল বর্ষীয়ান ব্যক্তি আমার এ দাবির পক্ষেই কথা বলবেন। যারা আমার বিরুদ্ধে সোচ্চার তারাও জানে যে, এ সকল অভিযোগই সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সব অপবাদ ও মিথ্যা তথ্য লিখে প্রচার করেছে সেসব তথ্যই ওই জংলি আইনে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার বিধান রয়েছে, যাতে বিচারে সরকারের মনমতো শাস্তি দেওয়া যায়। তাই, এ আইনে বিচার হলে সুবিচারের কোনো আশাই করা যায় না।

বাংলাদেশে ভারতের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তাদের সেনাবাহিনীর ভূমিকাকেই বড়ো করে দেখে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কৃতিত্ব সবটুকুই ভারত তাদের বলে মনে করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে তারা স্বীকারই করে না। তাই, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে সেখানে হাজির হতেই দেওয়া হয়নি। প্রায় এক লাখ বন্দি পাকিস্তানি সৈন্যকে বাংলাদেশে না রেখে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পাক বাহিনীর সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম লুট করে ভারতে নিয়ে গিয়েছিল তারা। অথচ, এসব বাংলাদেশের সম্পদ ছিল। বাংলাদেশ রেলওয়ে সহ অন্যান্য সংস্থার সম্পদও ভারত লুট করে নিয়ে যায়। এমনকী আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোও তাদের লুণ্ঠনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

আসলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ভারত

এগিয়ে আসেনি। তাদের চিরশত্রু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের কুক্ষিগত করে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা সবকিছু করেছে। তাদের পরবর্তী আচরণ সে কথাই প্রমাণ করে। দেশবাসী বিবেচনা করে দেখুন, ১৯৭১ সালে ভারতীয় আধিপত্যের যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা সত্যে পরিণত হচ্ছে কিনা? বিগত ৪০ বৎসরের ইতিহাস এ সত্যের এক জ্বলন্ত সাক্ষী।

ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষশক্তি হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করত না, আমাদের পানি সম্পদ নিয়ে আমাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করত না বা বর্ষায় পানি ছেড়ে দিয়ে বন্যার সৃষ্টি করত না। ভারতের পণ্য বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে। সীমান্তে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশি মানুষকে পাখি শিকারের মতো গুলি করে হত্যা করছে ভারত। জনগণ বিক্ষুব্ধ হলেও সরকার এর প্রতিকার করছে না। এর পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট ও করিডোর আদায় এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে তার আঙিনা বানাতে চাচ্ছে। এটা হলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলবে।

এসব কারণেই বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে বন্ধু মনে করে না। নিরপেক্ষভাবে জনমত যাচাই করলে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে। ভারত বাংলাদেশকে প্রায় চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে আছে। যদি কখনো এ দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহলে একমাত্র ভারতই করবে। এটা বড়োই দুঃখের বিষয় যে, জনগণ ভারতকে বন্ধু মনে না করলেও সরকার ভারতকে শুধু বন্ধুই মনে করে না, জনগণের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাকুক তারা কখনো ভারতের কোনো মন্দ আচরণের প্রতিবাদ করে না। বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে ভারত যা দাবি করে তা সবই তারা বিনা দ্বিধায় দিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধী হলেও ভারতের স্বার্থ বজায় রাখতে তারা অতি উৎসাহী। অথচ, বাংলাদেশের জনগণ দৃঢ়ভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদেরকে সম্বোধন করে আবার কিছু বলার সুযোগ পাব কিনা জানি না। তাই, প্রাসঙ্গিকভাবে আমি যা বলতে চাই তার প্রয়োজনে পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে দু–এক কথা উল্লেখ করতে হয়।

চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, যুদ্ধের পর তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে। মি. গান্ধী ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল থেকে দাবি করা হয় যে, ভারতীয় জাতীয়তা ও সেকুলার গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত 'এক রাষ্ট্র' হবে, কারণ ভারতের সকল ধর্মের মানুষ এক জাতি। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের মতো নেতারা দাবি করলেন যে, 'মুসলিমরা আলাদা জাতি'। ৪০ কোটি ভারতবাসীর রাষ্ট্রে ১০ কোটি মুসলমান ৩০ কোটি হিন্দুর শাসনাধীন হলে মুসলিমরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবে না। তাই, মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে ভারত থেকে আলাদা করে পাকিস্তান কায়েম করার আন্দোলন হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শিক লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তার ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। এই বিভেদ বঞ্চনা থেকেই পৃথক হওয়ার ধারণার জন্ম। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ বিভক্ত ভারত ও বিভক্ত পাকিস্তানের উত্তরসূরী। এই বিভক্তির ফলে আমরা আলাদা জাতিসত্তা ও স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিগত ৬০ বৎসর ধরে ভারতে মুসলমানদের যে দুর্দশা চলছে, ভারত বিভক্ত না হলে বাংলাদেশের মুসলমানদেরও একই দুরবস্থা হত। পাকিস্তান হওয়ার কারণেই সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের এত ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছিল। ভারত বিভক্ত না হলে ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যে উন্নতি হয়েছে তা কখনো হত না। আমরা স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি ১৯৪৭–এর দেশ বিভাগের ফল হিসেবেই।

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (সা)–কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। রাসূল (সা) কুরআনের জীবন বিধান বাস্তবে চালু করেই ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেন। তিনি ইসলামকে শুধু কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মনে করেননি। মানবজাতির পার্থিব সুখ–শান্তি ও আখিরাতে সাফল্যের জন্যই আল্লাহ কুরআন নাযিল করেন।

বাংলাদেশে ধর্মহীন সেকুলার মতবাদ কায়েম করা হলে কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে কোনো পার্থক্য আর থাকবে না এবং ভারত বিভাগ ও আমাদের আলাদা স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না। এই কারণেই আমরা বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন, সুখী ও ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। তাহলেই আমাদের স্বাধীনতা অর্থবহ হবে। তা না হলে এদেশ একদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কবলে পড়ে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের সেকুলার সরকার আমাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তি ইসলামকে এ দেশের জনজীবন থেকে উচ্ছেদ করে কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনের পথই পরিষ্কার করছে।

আমি মুসলিম দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানাই, যেন তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে এ দেশে ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের জন্য জান–মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালান। কারণ, এটা ঈমানেরই দাবি এবং এটা স্বাধীনতারও একমাত্র গ্যারান্টি।

প্রিয় দেশবাসী,

দেশ বর্তমানে এক কঠিন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সমাধান ব্যতীত দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই, দলমত নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব জাতীয় সঙ্কট উত্তরণে কাজ করে যাওয়া একান্ত জরুরি।

এখন বিভাজনের সময় নয় —— জাতীয় বৃহত্তর ঐক্যের সময়। দেশের অগ্রগতি অর্জনের স্বার্থে আমাদের পেছনে তাকানোর সময় নেই; আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে হবে। আমি কামনা করি, বর্তমান সরকার এবং ভবিষ্যতেও যাঁরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন তাঁরা দলমত নির্বিশেষে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে বাংলাদেশকে একটি ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। আমি দোআ করি, দেশের শাসকগণকে আল্লাহ যেন হীন দলীয় স্বার্থ ও হিংসা–বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে সঠিকভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার তাওফীক দেন, আইনি সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যা করণীয় তা তারা করেন, সামাজিক নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাগরিকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বয়স্ক, দরিদ্র ও ইয়াতিমদের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে, এ দেশের মানুষকে আধুনিক, সুশিক্ষিত, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবি করছি যে, আমি কখনো কোনো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না। এক শ্রেণীর অন্ধ স্বার্থান্বেষী মহল আমাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিগত প্রায় ৪০ বৎসর যাবত এ ধরনের ঘৃণ্য অপপ্রচার করে জনমনে আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুট করছে। আজ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কোথাও কোনো মামলা হয়নি। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার অন্যায়ভাবে আমার জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকার হরণ করলেও পরবর্তীতে, ১৯৯৪ সালে, সুপ্রিম কোর্টের সর্বসম্মত রায়ে আমি আমার জন্মগত নাগরিক অধিকার ফিরে পাই এবং আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এখন নতুন করে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আবার সেই একই অভিযোগের অবতারণা করা হচ্ছে।

আমি জেল, জুলুম, নির্যাতন, এমনকী মৃত্যুকেও ভয় পাই না। মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক, অনিবার্য। একদিন সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আখিরাতে বিশ্বাস করি, তাক্বদির বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না এবং তিনি যা করেন তা বান্দাহর কল্যাণের জন্যই করেন। সুতরাং, আমি আমার মৃত্যু নিয়ে সামান্যও শঙ্কিত নই। আমি নিশ্চিত, আমি এ দেশের মানুষের অকল্যাণের জন্য কোনো কাজ কোনোদিনই করিনি। নিরপেক্ষ তদন্ত ও নিরপেক্ষ বিচার হলে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যাঁরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাঁরাও জানেন যে, আমি দোষী নই, এ সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে যে রকম প্রহসনের বিচার হচ্ছে তেমন হলে তো আর কোনো বক্তব্য থাকে না।

আমার দীর্ঘ ৫০ বছরের কর্মজীবনে সারাদেশে ব্যাপক সফর করেছি। জনগণের মধ্যেই বিচরণ করেছি। উন্নত নৈতিক চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। মানবতাবিরোধী যেসব অপরাধের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে তা কখনো জনগণ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ফাঁসি দিলেও জনগণ আমাকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবেই গণ্য করবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, বলতে চাই যে, দেশের মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আমি নিজের সারাজীবন উৎসর্গ করেছি। আত্মপ্রচার বা আত্মপ্রতিষ্ঠা কখনোই চাইনি। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমিই একমাত্র কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় দলীয় প্রধানের পদ থেকে অবসর নেওয়ার মতো নজির সৃষ্টি করেছি। কোনো প্রতিদান বা স্বীকৃতি কারো কাছে কোনোদিন চাইনি; এখনও চাই না। আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। তবে আপশোশ, দেশ এবং জাতির জন্য যা চেয়েছি তা দেখে যেতে পারব কিনা। দোআ করি, আল্লাহ এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে হেফাযত করুন, দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা দেশের মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি দান করুন, আমীন।

আপনাদের নিকট দোয়া চাই। আল্লাহ তাআলা যেন আমার নেক আমলগুলো মেহেরবানী করে কবুল করেন, যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করেন এবং আখিরাতে সাফল্য দান করেন।

(আমার ওপর জামায়াতে ইসলামির প্রতিনিধিত্বের কোনো দায়িত্ব নেই। তাই আমার এই বক্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত। এর সাথে জামায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই।)

বাংলাদেশের ব্লগারদের খোলা উঠোন

শমীক সরকার

ক্ষমতার **খেলাঘর শক্তিশালী গণমাধ্যমের বিপরীতে ইন্টারনেট যে একটা খুবই শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম, তা বেশ কয়েকবছর আগেই বোঝা গেছিল। ইন্টারনেট সামাজিক কথোপকথনের একটা জায়গা, নিজের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত। এবং এই পরিসরে বাস্তব সমাজে মাতব্বর যারা, তাদের মাতব্বরি তুলনায় কম। কোনো এক সাধারণ মানুষও তার কথাটা একটু গুছিয়ে যদি বলতে পারেন, তাহলে শ্রোতা পাওয়া যাবে। বড়ো মিডিয়া — টিভি বা দৈনিক সংবাদপত্র বা বড়ো ম্যাগাজিনে যুগ যুগ ধরে যেভাবে তালেবড়, মাতব্বর আর পারদর্শীদের কথাই শোনা যায়, ইন্টারনেট তার থেকে আলাদা। কেউ পারদর্শী বা মাতব্বর বা এমনকী খুব সঠিক না হয়েও তার কথা প্রকাশ করতে পারে ইন্টারনেটে। টিভি, রেডিও বা সংবাদপত্রে একবার একটা কথা প্রকাশ পেলে তার ক্ষমতা অনেক বেশি। কারণ একটি প্রোগ্রাম লক্ষ লক্ষ লোক দেখা বা শোনার রেডিমেড বন্দোবস্ত সেখানে থাকে। আপনি চান বা না চান, সেটা আপনি দেখতে/শুনতে বাধ্য। যেমন, আপনি যদি চান, দৈনিক সংবাদপত্রে ধোনির কেরামতি নিয়ে লেখা পড়বেন না, মনমোহনের কথা শুনবেন না বা মমতার মুখ দেখবেন না, তাহলে কি পারবেন? পারবেন না। টিভি খুললে বা দৈনিকের পাতা খুললেই তারা হাজির। ইন্টারনেট তার তুলনায় অনেক গণতান্ত্রিক। আপনি না চাইলে এসব নাও দেখতে পারেন। সেখানে একই জিনিস লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে বাধ্য তো নয়ই, দেখেও না। তাই সেদিক দিয়ে দেখলে ইন্টারনেটের ক্ষমতা অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় অনেক কম। আর তাই সে সুন্দর। মাতব্বরি, তালেবরি বা পারদর্শিতাকে হাজার হাজার লোক ধন্য ধন্য করবে — এর জন্য ইন্টারনেট নয়। অন্তত ইন্টারনেটের মৌলিক ডিজাইনের মধ্যে তা নেই। এটা বড়ো পরিসর, অর্থাৎ ক্ষমতার পরিসর নয়। ছোটো পরিসর, অর্থাৎ সামাজিক পরিসর। আর তাই ইন্টারনেট নিঃসন্দেহে ক্ষমতামুক্ত সমাজের পথে যাত্রার পাথেয়। বলাই বাহুল্য, ওই পথে পরিত্যাজ্য বড়ো মিডিয়া — টিভি, বড়ো দৈনিক ...।**

এই **কথাগুলো আরেকবার মনে করিয়ে দিল বাংলাদেশের**

শাহবাগ আন্দোলন।

মাতৃভাষায় ইন্টারনেট

বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার শুরু নেট–এ বাংলা ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ইন্টারনেট ইংরেজিতে তৈরি। কম্পিউটারও তো ইংরেজিতেই তৈরি। কিন্তু কম্পিউটারে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল, কারণ তা নাহলে তো সেটা কেবল ইংরেজি দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে! বিভিন্ন ভাষাকে 'কম্পিউটিং'–এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি ভাষার লিপি সম্বলিত একটি সম্মিলিত লিপিমালা তৈরি শুরু হয়েছিল। সেই প্রয়াসেই 'ইউনিকোড' নামে একটি স্ট্যান্ডার্ড–এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৯১ সালে (ইউনিকোড কনসর্টিয়াম নামে একটি অলাভজনক সংস্থার মাধ্যমে)। সেই প্রথম ভার্সানেই অন্য আরও তেইশটি ভাষার লিপির সঙ্গে বাংলাও ছিল। এখন ইউনিকোডে মোট ১০০টি ভাষার লিপি এসেছে। এই সম্মিলিত লিপিমালার স্ট্যান্ডার্ডের বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি ভাষার প্রতিটি লিপির প্রতিটি পৃথক বর্ণ এবং সংযোজনী (যেমন বাংলায় আ–কার, উ–কার প্রভৃতি)–র জন্য পৃথক পৃথক 'কোড' থাকবে। যেমন বাংলার জন্য ধরা আছে আছে ১৪৪টি কোড, যার মধ্যে ১০৮টি কোডে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি, স্বরবর্ণগুলি, সংযোজনীগুলি এবং সংখ্যাগুলির (০–৯) জন্য নির্দিষ্ট করা আছে, বাকিগুলো এখনও ফাঁকা। যুক্তবর্ণগুলির জন্য কোনো কোড রাখা নেই। একাধিক কোডকে একটু কায়দা করে ব্যবহার করার মাধ্যমেই যুক্তবর্ণ বানিয়ে ফেলা যায়। কি–বোর্ড লে–আউট যারা বানায়, তারা এই ব্যবহার জানে। এরপরের কেরামতিটা ফন্ট–এর, যারা ফন্ট বানায়, তাদের। উদাহরণ, ইউনিকোডে 'ক', বিরাম সংযোজনী '্' এবং 'ষ'–র জন্য আলাদা কোড আছে। এই তিনটি পরপর কি–বোর্ড দিয়ে টেনে আনলে 'ক্ষ' তৈরি হয়। কিন্তু এই 'ক্ষ'–টা তখনই দেখাবে, যদি যে ফন্ট ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে 'ক্ষ' অক্ষরের ছবিটা থাকে এবং বলা থাকে যে কি–বোর্ডে এই তিনটি পরপর চাপলে এই ছবিটি আসবে। সেজন্য চাই ইউনিকোড মেনে চলা কি–বোর্ড এবং ইউনিকোড মেনে চলা ফন্ট।

'ইউনিকোড' ছাড়াও এরকম লিপির স্ট্যান্ডার্ড আরও কিছু আছে, যেমন অ্যাসকি, বিভিন্ন আইএসও। কিন্তু সেগুলোতে প্রতিটি ভাষার প্রতিটি লিপির প্রতিটি বর্ণের জন্য আলাদা করে কোড রাখার সার্বজনীন ভাবনা নেই। ফলে আপাতভাবে কাজ চলে গেলেও, তা ইন্টারনেটের দুনিয়াতে — যেখানে সব ভাষার মানুষ ব্যবহারকারী, সেখানে অচল। বলে রাখা ভালো, পেজমেকার বা অ্যাডোব–এর সফ্‌টওয়ারগুলি, যেগুলিতে বাংলা প্রেসের কাজ হয়, তা সে এপার বাংলা বা ওপার বাংলা যেখানেই হোক — সেইসব সফ্‌টওয়ারগুলি মূলত ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে না। প্রথমদিকে মাইক্রোসফ্‌টও ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মানত না। কিন্তু আস্তে আস্তে সুরসুর করে এইসব সফ্‌টওয়ার দৈত্যগুলিও ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

'ইউনিকোড' স্ট্যান্ডার্ডে বাংলার পুরোদস্তুর উন্নতি হতে সময় লেগেছিল। ৎ, রেফ্‌ প্রভৃতির জন্য কোনো কোড ছিল না। তার কারণ, বাংলাভাষীদের তা নিয়ে খুব একটা গরজ ছিল না। বাংলাভাষার প্রেসের কাজ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিব্বি চলে যাচ্ছিল। আরেকটা সমস্যা ছিল ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ডের কি–বোর্ড এবং ফন্ট। আগে অ্যাসকি স্ট্যান্ডার্ডের কিছু বাংলা কি–বোর্ড লেআউট এবং ফন্ট ছিল। সেগুলো দেখতে বেশ ভালো। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বড়ো ছোটো প্রেসের কাজ সেসব দিয়েই চলত। কিন্তু প্রথমত, সেগুলি সবই ছিল বাণিজ্যিক। এবং সেগুলি মুক্ত সফ্‌টওয়ার তো নয়ই। তার ওপর সেগুলো ইন্টারনেটে ব্যবহারযোগ্যও নয়। ইন্টারনেটে বাংলার বিস্তার না হলে বাংলা টাইপিং কিন্তু প্রফেশনালদের কাজ হয়েই থেকে যেত। সাধারণের জিনিস হয়ে উঠত না।

২০০১ সাল নাগাদ এক সাথে অনেকগুলি ঘটনা ঘটার জন্য ইন্টারনেটে বাংলা বিস্তারের ক্ষেত্র খুলে যায়। প্রথমত, বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে ব্যবহার হওয়া অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফ্‌ট উইন্ডো–র এক্সপি সার্ভিস প্যাক–২ ভার্সানে বাংলা স্ক্রিপ্ট আসে, অর্থাৎ তা ইউনিকোডের পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডার্ড মেনে নেয়। এবং সঙ্গে একটা ফ্রি ইউনিকোড বাংলা ফন্টও দেয়, বিচ্ছিরি দেখতে, নাম বৃন্দা। ওই ২০০১ সালেই বাংলাদেশের একটি কি–বোর্ড লেআউট ও ফন্টের কোম্পানি 'একুশে' কিছু ইউনিকোড বাংলা ফন্ট এবং কি–বোর্ড লেআউট বাজারে ছাড়ে। কিন্তু এইসব কি–বোর্ড লেআউটগুলি সবকটি ছিল বেশ কঠিন। বিশেষত, ইংরেজি কি বোর্ড লেআউটে অভ্যস্ত বাংলাভাষী ব্যবহারকারীদের পক্ষে সেটি বেশ জটিল ছিল। তাই ২০০১–এ শুরু হলেও, বাংলা ভাষায় ইন্টারনেট গড়গড়িয়ে এগোয়নি।

এই ফাঁক পূরণ করেন ময়মনসিং মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র মেহদি হাসান খান। তিনি 'ফোনেটিক' বাংলা কি–বোর্ড লেআউট সমৃদ্ধ 'অভ্র' তৈরি করেন (প্রথম প্রকাশ ২০০৩ সালের মার্চ মাস)। সত্যি কথা বলতে, অভ্র কোনো কি–বোর্ড লেআউট নয়, এটি একটি মধ্যবর্তী স্তর। এতে k টিপলে 'ক' আসে। ইংরেজি কি–বোর্ড লেআউটে অভ্যস্ত বাংলাভাষীর সেই অভ্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে বানানো এই বুদ্ধিদীপ্ত সফ্‌টওয়ারটির কল্যাণে বাংলা কম্পিউটিং–এ জোয়ার আসে। বাংলা টাইপ করা খুবই সহজ হয়ে যায়। ইন্টারনেটে বাংলাতেও জোয়ার আসে। এই 'অভ্র' সফ্‌টওয়ারটি খুব সহজে বিনা পয়সায় ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে নিয়ে মাইক্রোসফ্‌ট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমওয়ালা মেশিনে ইনস্টল করে নেওয়া যায়। মেহদি হাসান উন্মুক্ত এবং মুক্ত সফ্‌টওয়ার–প্রেমী লোক হওয়া সত্ত্বেও প্রথমদিকে অভ্র–র প্রোগ্রামটিকে প্রকাশ করেননি বা অভ্রকে মুক্ত করেননি। কারণ, তাঁর ভয় ছিল, এই প্রোগ্রামটিকে মুক্ত করে দিলে অন্য কেউ এই প্রোগ্রামটিকে ব্যবহার করবে পাসওয়ার্ড বা অন্যান্য গোপন জিনিস তুলে নেওয়ার কাজে। যেহেতু অভ্র একটি কি–বোর্ড লেআউটের মধ্যবর্তী স্তর, তাই তার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কি–বোর্ডে যা টাইপ করা হচ্ছে, তা তুলে নেওয়া খুব সোজা। আমার মনে হয়েছে, এই কাণ্ডজ্ঞান বাংলাদেশের কম্পিউটার জগতের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য, তার উৎকর্ষের কারণও বটে। (প্রসঙ্গত বলা ভালো, পশ্চিমবঙ্গেও যে ২০০২–২০০৩ সাল নাগাদ বাংলায় কম্পিউটার বা মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম লিনাক্স নিয়ে সাড়া পড়েনি তা নয়। লিনাক্সের বাংলা সংস্করণের প্রকল্প 'অঙ্কুর'–এ জড়িয়ে ছিল

দক্ষিণ কলকাতার স্কুল ছাত্র সায়মিন্দু, বাংলায় লিনাক্স শেখার একটি অসাধারণ বই লিখেছিলেন নবীন শিক্ষক দীপঙ্কর। তার আগে শত শত প্রোগ্রামারের বানানো মুক্ত পেজ মেকিং সফ্‌টওয়ার ল্যাটেক–এ বাংলা জুড়েছিলেন বিজ্ঞান গবেষক পলাশ বরণ পাল।)

একইসঙ্গে ইন্টারনেট ডায়েরি বা ওয়েবলগ বা সংক্ষেপে ব্লগে বাংলায় যা খুশি লিখে প্রকাশ করা শুরু করে বাংলাদেশের বাংলাভাষীরা। তার একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাক। ইন্টারনেটে স্বাধীন ছোটো প্রকাশনার মূল হাতিয়ারই হল এই ব্লগ। গুগল কোম্পানির বদান্যতায় এই ব্লগ বিখ্যাত হয়ে ওঠে, তারা ব্লগার ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট কিনে নেয় এবং সেখানে অতি সহজে ব্লগ তৈরির ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কেউ কেউ ব্লগে বাংলা লেখার ব্যাপারে প্রাথমিক দিনগুলিতে উদ্যোগ নিলেও তারা বাংলা ব্লগ নিয়ে তারপর আর মাথা ঘামায়নি। ইংরেজিতে ব্লগ লিখে দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়াতেই বেশি উৎসাহ ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বাংলাভাষীরা বাংলায় ব্লগ লিখতে শুরু করে। প্রথম ধারাবাহিকভাবে বাংলা ব্লগ লিখতে শুরু করেন বাংলাদেশের রেজওয়ান ইসলাম, ঠিকানা **http://amibangladeshi.blogspot.com,** নাম 'ছেঁড়া পাতার কথামালা'। রেজওয়ান ২০০৩ সালে ইংরেজিতে ব্লগ লিখতে শুরু করেন, ২০০৪ সালের এপ্রিলে বাংলায় শুরু করেন। তাঁর ব্লগ লেখার শুরু নিয়ে লেখা, 'সেটি ছিল ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক দিন। তখন ইরাক যুদ্ধের গরম খবরে পূর্ণ পত্রিকাগুলো। হঠাৎ দেখলাম সালাম পাকশ–এর ওয়েবলগ সম্পর্কে একটি লেখা। ওটি ছিল ব্লগার–এ হোস্ট করা। সালাম এবং অন্যান্যদের লেখা পড়ে আমার অন্য একটি জগৎ উন্মোচন হল। আমার মনে হল, আমারও অনেক কিছু বলার আছে। উৎসাহী আমি নিজেই একটি ওয়েবলগ শুরু করলাম 'তৃতীয় বিশ্বের চোখে'। প্রথম দিকে আমার যাত্রা ছিল উদ্দেশ্যবিহীন। তারপর লক্ষ্য করলাম যে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশিদের তেমন একটা ধারণা নেই। শুধু হেডলাইনে পড়া খারাপ খবরগুলো (বন্যা, দারিদ্র্য, মৌলবাদ) দিয়েই দেশের পরিচয়। এদেশের মানুষদের তো আর সেই ভুল ভাঙানোর তেমন সুযোগ নেই। তখন মনে হল ওয়েবলগ হতে পারে বাংলাদেশিদের সেই কণ্ঠস্বর।' পরে বাংলায় ব্লগ লেখা শুরু করার পর রেজওয়ান দৈনন্দিন জীবন নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট (একটি পোস্ট মানে একটি প্রকাশনা) দেওয়া শুরু করেন। তার একটি নমুনা, 'আজ আমার খুব উদাস লাগছে। আবহাওয়াটা কেমন যেন। বাইরে কাঠফাটা রোদ্দুর। অফিসের ভিতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্তর কাজ করছে কিন্তু আমার মনকে ঠান্ডা রাখতে পারছে না। খালি মনে হচ্ছে আমি এসব কী করছি কেন করছি। ...'

২০০৫–০৬ থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় কমিউনিটি ব্লগিং। অর্থাৎ একটাই ব্লগ–ঠিকানায় একাধিক ব্লগার–এর ব্লগ (ব্লগ যারা লেখে তাদের বলা হয় ব্লগার। আগেই দেখেছি আমরা, ব্লগ লেখার প্রযুক্তি সম্বলিত ওয়েবসাইটটির নাম ছিল ব্লগার ডট কম)। ২০০৫ সালে তৈরি হয় 'বাঁধ ভাঙার আওয়াজ' ব্লগ, যার ঠিকানা **www.somewhereinblog.com.** ২০০৭ সালে এটাতে খুব সহজে ওয়েবপেজেই এমবেড করা বাংলা ইউনিকোড এবং ফোনেটিক কি বোর্ড লেআউটগুলি দিয়ে ব্লগ লেখার বন্দোবস্ত হয়। ওই একই সময় আরও কয়েকটি কমিউনিটি ব্লগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় বাংলাদেশে, যেমন সচলায়তন প্রভৃতি। এখন এইসব ব্লগ প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ব্লগার রয়েছে। এই ধরনের ব্লগ প্ল্যাটফর্মের সংখ্যাই কয়েকশো। বাংলাদেশের ব্লগ নিয়ে বই–ও বেরিয়েছে, বাংলা ব্লগের ইতিবৃত্ত, প্রকাশক শুদ্ধস্বর (২০১২)। বাঁধ ভাঙার আওয়াজ বা সামহোয়্যার ইন ব্লগ (ডাকনাম সামু) বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো কমিউনিটি ব্লগ, এটাতে ব্লগারের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই ব্লগ প্ল্যাটফর্মটির মালিকের একটি সাক্ষাৎকারে এই ব্লগটির সূচনা সম্পর্কে কথা রয়েছে, '... সেই সময় সারা বিশ্বে ইন্টারনেটের জয়জয়কার। সবাই ভার্চুয়াল জগতে লিখে মেধাচর্চা বা মতপ্রকাশে ব্যস্ত। যার মাধ্যম ছিল প্রধানত ইংরেজি। আমাদের দেশেও কিছু মানুষ ইংরেজিতে আগে থেকেই ব্লগিং করতেন। তাতে স্বভাবিকভাবেই ইংরেজিতে যারা দুর্বল তারা মুক্তবুদ্ধি চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। আবার ইংরেজিতে পারদর্শীরাও ইন্টারেনেটে বাংলায় লেখার প্ল্যাটফর্ম খুঁজে বেড়াতেন। প্রকৃতপক্ষে 'ব্লগিং' ধারণাটি তখনও ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনমত তৈরির মূলধারার মাধ্যমগুলোতে যখন দ্বিপাক্ষিক অংশগ্রহণ সম্ভব নয় তখন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাত্যহিক জীবনের আলাপচারিতায় সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি মাথায় রেখে এই বাংলা কমিউনিটি ব্লগিং–এর শুরুটা করে দেয় সামহোয়্যার ইন।' বাংলাদেশের ব্লগ জগতের অন্যতম বড়ো প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই ব্লগটিতে যারা নিয়মিত ভিজিট করে তারাই জানে, এটি দেখতে তেমন ঝিনচাক নয় বা স্মার্ট নয়। এটির জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীলতা, মাতৃভাষা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বেশ পক্ষপাত আছে। আর যাই হোক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বড়োসড়ো কিছু মানেই যেমন তা কর্পোরেট কিছু, এটি তা নয়। প্রতিদিন এটাতে অসংখ্য ছোটো বড়ো পোস্ট আসে, এবং বিভিন্ন বিষয়ে। এইসব ব্লগ প্ল্যাটফর্মগুলির বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রতিটি পোস্ট–এর নিচের পাঠকের মন্তব্য সেকশনটি।

বাংলাদেশে মাতৃভাষায় ইন্টারনেটের এই প্রচেষ্টা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের ডোমেনগুলির মধ্যে বাংলায় একটি সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা' এবং একটি বাংলা মাইক্রো ব্লগিং ওয়েবসাইট (অনেকটা 'ট্যুইটার' ও 'রেডিট'–এর মতো) 'বেশ তো' শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে। এবং রাষ্ট্রীয় মদতে নয়, কর্পোরেট প্রচেষ্টাতেও নয়। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের নতুন প্রজন্মের হাতেই তৈরি হয়েছে এগুলো।

স্বাধীন, মুক্ত পরিসর

বাংলাদেশের ব্লগের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, তার মুক্ত পরিসর। ব্লগ মাধ্যমটিরই একটা পরিচয় হয়ে গেছে, তা পার্টিগুলির দলাদলির বিরুদ্ধে। ধর্ম নিয়ে অতি–সংবেদনশীল কিছু ব্লগার থাকলেও, ব্লগ পরিসরটি মূলগতভাবে ধর্মের ধার ধারে না। বরং ধর্ম নিয়ে সংবেদনশীলতার, বিশেষত বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের ন্যাকামির বিরুদ্ধে। কিছু কিছু ব্লগার তো ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধেই

সরাসরি লেখে। কর্পোরেট বিরোধিতাও ব্লগে প্রবল। মোদ্দায় বলা যায়, বাংলাদেশের 'মেইনস্ট্রিম'কে একহাত নেওয়ার ঠিকানা এই ব্লগ। এবং সেখানে প্রায় কোনো কিছুকেই রেয়াত করা হয় না। কাছা খুলে দেওয়া হয়। এই 'মুক্তবুদ্ধি চর্চা'র এত বড়ো একটা পরিসর সেদেশের মেইনস্ট্রিমের নজরে খুব একটা আসেনি। অথবা নজরে আসার আগেই ব্লগ বাংলাদেশের একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। যার প্রকাশ ঘটেছে শাহবাগ আন্দোলনের উদ্যোক্তা সংগঠন হিসেবে 'ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন একটিভিস্টস নেটওয়র্ক' আত্মপ্রকাশ করার মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিম — সংবাদপত্র প্রথম আলো বা আমার দেশ, পার্টি আওয়ামি লিগ বা বিএনপি — যারাই হোক, চোখ কচলে দেখেছে, গোকুলে বেড়ে উঠে সামাজিক শক্তি হিসেবে, শিক্ষিত বাঙালির নিজস্ব আন্দোলন হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের বাংলা ব্লগ।

বাংলাদেশের ব্লগগুলি মানবসমাজের মতোই বিচিত্র এবং সৃষ্টিসুখের উল্লাসভূমির মতো। কতখানি মুক্ত পরিসর এটা, এবং কতটা পরিণত, তা নিয়মিত ব্লগগুলি অনুসরণ না করলে ঠিক বোঝা যাবে না। তবে কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজের কাছে বাংলা ভাষার আবেগ বা চেতনা কোনো আদর্শ হিসেবে কাজ করে না, অন্তত চারপাশে তাকিয়ে তেমনটাই মনে হয়। বলে ফেলাই ভালো, পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত সমাজের নব প্রজন্ম আদর্শহীন। আমরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, আড্ডাখানায় তার প্রমাণ পাই। এক যুগ আগেও টিমটিম করে টিঁকে থাকা বামপন্থী আদর্শটি বাম রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে পড়ে বিদায় নিয়েছে। এর বাইরে আর কোনো কিছু নেই। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের নয়া প্রজন্মের কাছে কাছে কিন্তু একখানা আদর্শ রয়েছে। সেটি হল, মাতৃভাষার আদর্শ ও স্বাধীনতার চেতনা। সেই আদর্শের জন্য শহিদ হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের গর্ভে জন্ম নিয়েছে এই প্রজন্ম। সেই শহিদদের মধ্যে ছিল প্রথিতযশা বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত নবীন প্রজন্মের মধ্যে সেই আদর্শ এখনও উজ্জ্বল।

ওই মেহদি হাসান, খুব অনিয়মিত ব্লগ লেখেন সচলায়তন নামক ব্লগ প্ল্যাটফর্মটিতে। সেখানে লিখেছিলেন একটি ব্লগ, নাম 'ক্ষত', ১৪ ডিসেম্বর ২০১২ — 'আমরা যারা ড. জাফর ইকবালের বই পড়ে বড়ো হয়েছি, রাশেদের সাথে সেই যুদ্ধে আমরা সবাই ছিলাম। যুদ্ধে শহিদ হয়ে যাওয়া সব রাশেদ ছিল আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাই। আমরা যারা ড. জাফর ইকবালের বই পড়ে বড়ো হয়েছি, তারা জানতাম সবসময়, একজন বিখ্যাত মানুষ দিয়ে কিছু হয় না, কিন্তু একশজন খাঁটি মানুষ দিয়ে একটা দেশ পাল্টে দেওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কখনো সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না, আদিবাসী থোয়াংসা চাই ছিল আমাদের প্রাণের বন্ধু। আমরা যারা ড. জাফর ইকবালের লেখা শিশুসাহিত্য এখনো পড়ি, আমরা জানি এখন তিনি লিখে যান ডরেমন আর হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ... বেল অথবা ক্যালটেকে অনায়াসে যিনি নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন, সেই একজন ড. জাফর ইকবাল খ্যাপার মতো এদেশে পড়ে থেকে প্রজন্ম গড়ার জন্য লড়াই করে যান। প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর এলে এই কথাগুলো মনে হয়। কত অভাগা আমরা! এরকম একশোজন খাঁটি মানুষ বেঁচে থাকলে কত সহজে এই দেশটা পাল্টে দেওয়া যেত!'

এই মেহদি হাসানেরই আরেকটি ব্লগ ২০১১–র ফেব্রুয়ারিতে, সচলায়তনে, শিরোনাম, 'সময় থাকতে ফেসবুক নিয়ে ধান্দাবাজি বন্ধ করেন, গ্রামীণফোন'। এই গ্রামীনফোন হল মোবাইল কর্পোরেট টেলিনর–এর বাংলাদেশি রূপ। এরা একটি বিজ্ঞাপন ছাপে, তাতে লেখে, ফেসবুকের বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দিচ্ছে তারা, এবার বাংলাভাষায় ফেসবুক অনুবাদের কাজে হাত দিতে পারবে বাংলাদেশিরা। বলাই বাহুল্য, এটা একটা বাজে কথা। ফেসবুক অনুবাদের কাজে শত শত বাংলাভাষী এর মধ্যেই অংশ নিয়ে ফেলেছে, অর্ধেকের বেশি কাজ হয়েও গেছে। ব্লগে লেখা হয়, 'কোনোরকম কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান অথবা 'বাংলা ভাষার আপন কাণ্ডদের' সাহায্য ছাড়া ফেসবুকের অর্ধেকের বেশি বাংলা লোকালাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে, বাকিটাও হবে। যেমনভাবে হয়েছে উইকিমিডিয়া, ফায়ারফক্স, অপেরা, ওয়ার্ডপ্রেস, পানবিবি, পিএইচপিবিবি, নোম ইত্যাদি অসংখ্য সফটওয়ারের লোকালাইজেশনের কাজ। আমি বাংলা কম্পিউটিং সংক্রান্ত খবরের খোঁজ রাখার চেষ্টা করি সবসময়, তারপরও যেসমস্ত স্বেচ্ছাসেবক নিজের ব্যক্তিগত সময় এবং শ্রম দিয়ে এসব কাজ করেছেন তাঁদের বেশিরভাগকেই চিনি না। কারণটা খুব সহজ, আত্মপ্রচার নিয়ে তাঁরা লালায়িত নন। তাঁরা যেটা করছেন বা করছেন সেটা নিজের ভাষার জন্য ভালোবাসা থেকে আসা দায়িত্ববোধ থেকেই। তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে শিখুন। গ্রামীণফোন যেখানে এখন পর্যন্ত বুঝেও উঠতে পারে নাই লোকালাইজেশন প্রজেক্ট কিভাবে চলে, সেখানে '... গ্রামীণফোন ও ফেসবুক যৌথভাবে এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে আপনি চাইলেই হতে পারেন এর সফল অনুবাদক...' এ ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যাচার বন্ধ করুন। ফেসবুকে অনুবাদক হতে হলে কোনো ছাতা ফোনেরও দরকার নাই, যদু–মধু–কদু সবাই হতে পারে। আপনারা কী খান জানি না, কিন্তু পাবলিক 'যা গিলাবেন তাই খাবে' এটা ভাবলে এখনও বোকার স্বর্গে আছেন।'

একটি ব্লগের কথা না বলে পারছি না, মতিকন্ঠ নাম। খুব অশ্লীল ভাষায় যাবতীয় মাতব্বরদের (ইউনুস থেকে হাসিনা, খালেদা থেকে সাঈদি) গালি দেওয়া হয় তাতে, সংবাদকে বিকৃতভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে। সাইটটির দাবি, দৈনিক দুই লক্ষের বেশি লোক সাইটটি দেখে। এর প্রতিটি পোস্টই অসাধারণ, অশ্লীল ও রাস্তার ভাষা ব্যবহার আর আরবী–বাংলা মিশ্রিত শব্দচয়নে নির্মাণ করা আঙ্গিকে, এবং বিষয়বস্তুতে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কারণে। একটি উদাহরণ : 'সাভারে বিধ্বস্ত ভবন রানা প্লাজার মালিক ও সাভার যুব লিগের নায়েবে আমীর মো. সোহেল রানা বলেছেন, শেখ হাসিনা যুব লিগের কেউ নহে। আজ বাংলাদেশ হোটেল মালিক সমিতির সভাপতি ও ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী অ্যাডভকেট সাহারা খাতুনের মালিকানাধীন এমপেরিয়াল হোটেল এন্ড গেষ্ট হাউসে আত্মগোপন রত অবস্থায় মতিকণ্ঠকে দেওয়া এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন সোহেল রানা।

সোহেল রানা বলেন, আমি আজ টেলিভিশনে বাংলা

সিনেমা উপভোগ করছিলাম। এক ফাঁকে খবরে দেখলাম, প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী ভাষাকন্যা গণতন্ত্রের মানসকন্যা ড. শেখ হাসিনা বলছেন, সোহেল রানা যুব লিগের কেউ নহে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে রানা বলেন, আমি এর জবাবে বলতে চাই, শেখ হাসিনা যুব লিগের কেউ নহে। প্রমাণ হিসাবে যুব লিগের সকল নেতা–কর্মীর নামের তালিকা সম্বলিত একটি জাবেদা খাতা উপস্থাপন করে সোহেল রানা বলেন, এখানে কুথাও শেখ হাসিনার নাম নাই।

প্রধানমন্ত্রীকে নিজের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সোহেল রানা বলেন, আওয়ামি লিগের সংসদ সদস্য তৌহিদ জং মুরাদ নিজে আমায় কুলে করিয়া রানা প্লাজা হতে বাইর করছে। আমি যুব লিগের কেউ না হলে সে আমায় কুলে লইত?

আবেগঘন কণ্ঠে রানা বলেন, 'হিন্দুর জমি দখল করিয়া, পুষ্করিনী ভরাট করিয়া, পৌরসভার অনুমদনের পুটু মারিয়া তুললাম আলিশান ভবন। আমি যুব লিগের কেউ না হইলে এইসব কেমনে তুললাম? ... তার নামে গ্রেফতারি পরয়ানার কথা জানালে রানা বলেন, কুথায় কুন পুলিশ রেবের বাচ্চা আমায় গ্রেফতার করবে? কয়েকটা দিন এমপেরিয়ালের সকল নাগরিক–সুবন্দবস্ত উপভোগ করিয়া আগরতলা চলে যাব। মখা সারকে টেকাটুকা দেওয়া হইছে। পরয়ানা থাকবে পরয়ানার জায়গায় আমি থাকব আমার জায়গায়। পরয়ানার পরয়া না করি।'

এই পোস্টটি সাভারে ছশোর বেশি শ্রমিক কারখানা ভবন চাপা পড়ে মারা যাওয়ার পর দেওয়া হয়েছে। ভবনটির নাম রানা প্লাজা, মালিক সোহেল রানা নিয়ে যেসব তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে, যেমন মুরাদ নামে আওয়ামি লিগের এক নেতা রানাকে উদ্ধার করেছে, কী করে বানানো হয়েছে রানা প্লাজা, হাসিনা বলেছেন যে রানা যুব লিগের কেউ না, এবং রানার লুকোনোর জায়গা — সবগুলিই সত্য এবং সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এর আগে গার্মেন্টস কারখানা তাজরিন ফ্যাশন্স–এ আগুন লেগে শতাধিক শ্রমিক মারা যায়, কারণ আগুন লাগার পর মালিক বাইরের গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনার পরও তাজরিন মালিকের কিস্যু হয়নি। যাই হোক, নির্মম সত্যগুলির ওপর ভিত্তি করে লেখা এই 'খবর'টি। সঙ্গে একটি ফটোগ্রাফ — তাতে যুব লিগের সাভার ইউনিটের একটি পোস্টারে রানার ছবি ও নাম। বাংলাদেশের ঘুণ ধরে যাওয়া রাজনৈতিক সমাজের প্রতি এক থাপ্পড়ের মতো এটি। এইরকমই দিনে অন্তত একটি পোস্ট–এ বাঙলাদেশের সমস্ত মাতব্বরদের নাঙ্গা করে দেয় দৈনিক মতিকন্ঠ।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মিডিয়ার নাম প্রথম আলো, আমাদের আনন্দবাজারের মতো তার দাপট সেখানে। সেই কাগজের সম্পাদকের নাম মতিউর রহমান। সেই কাগজকে ব্যঙ্গ করেই নাম দেওয়া হয়েছে দৈনিক মতিকন্ঠ — সন্দেহ নেই।

প্রয়োজনে এই বড়ো মিডিয়াকে কেমন একহাত নিতে পারে ব্লগাররা, তার একটা নমুনা দেওয়া যাক। এ বছর পয়লা বৈশাখে প্রথম আলো পত্রিকাটিতে একটি সাপ্লিমেন্ট বেরোনোর কথা ছিল, তার অনলাইন কপি, যেটি প্রিন্টের আগে প্রকাশিত হয়, তাতে ১৩ এপ্রিল দুটি গল্প ছাপা হয়েছিল — একটি একুশে পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই এবং অন্যটি প্রথম আলোর নিজের বানানো একজন লেখকের। প্রথম লেখার উপজীব্য ছিল, মফস্বল থেকে এসে শাহবাগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া মেয়েরা শাহবাগের পুরুষ নেতাদের শয্যাসঙ্গিনী হচ্ছে, কখনো বা হতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয় লেখার উপজীব্য, শাহবাগ আন্দোলন বড়োলোকেদের ব্যাপার, এখানে বড়োলোকের ছেলেরা এসেছে গার্ল ফ্রেন্ড জোটানোর আশায়। গল্প হিসেবে অতি মামুলি ওইদুটি যে শাহবাগ আন্দোলন সম্পর্কে জামাত–শিবিরের অপপ্রচারকেই ইন্ধন দেয়। প্রথম আলো শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষ নেওয়ার ফলে কাগজের শাহবাগ বিরোধী পাঠক যারা মুখ ফিরিয়েছে তাদের ফের কাছে টানতেই যে প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ ওই দুটি গল্প প্রকাশ করতে চাইছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া শাহবাগ বিরোধী পত্রিকা আমার দেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার ২ লক্ষ পাঠককে পাওয়ার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন ব্লগে এই দুটো গল্পের বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ ওঠে। পরদিন সকালে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। অবস্থা সঙ্গীন বুঝে প্রথম আলো ১৫ এপ্রিল গল্প দুটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই গল্প প্রসঙ্গে ওই সময় প্রকাশ হওয়া দুটি ব্লগের কিছু অংশ এখানে দিচ্ছি। প্রথমটি, 'আমার ব্লগ' নামক ব্লগ প্ল্যাটফর্মে রিনভি তুষার নামে একজন ১৬ এপ্রিল তিনি লেখেন, '... আমার বলাতে আর কীইবা আসে যায়? কোনো জনপ্রিয় লেখক, কবি বা সাহিত্যিক এর প্রতিবাদ করবেন না। কোনো নায়িকা, নায়ক, গায়িকা, গায়ক (যাদের আমরা শাহবাগ গণবিস্ফোরণের কল্যাণে অনেক সাধারণ হিসাবে আবিষ্কার করেছি), কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও এর প্রতিবাদ করবেন না। ওনারা ভালো করেই জানেন, ওনারা জনপ্রিয়। কারণ ওনারা প্রথম আলো–র প্রিয়। জনপ্রিয় থাকতে হলে আর জনপ্রিয় হতে হলে সবই করা যায়, শুধুমাত্র প্রথম আলো–র সমালোচনা করা যায় না। সালাম ঠুকতে হয় নিয়মিত প্রথম আলো–কে। ওনাদের মগজের সম্পূর্ণ ঠিকাদারি প্রথম আলো–র হাতে। প্রথম আলো যেমন গান গাইতে বলে তেনারা তেমন গানই গান। প্রথম আলো যে জলে নাইতে বলে তেনারা সে জলেই সারেন স্নান। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দিনের খামের লোভে, নিমন্ত্রণের লোভে। কয়েক ইঞ্চি সাদা–কালো (বিশেষ খাতিরে রঙিন) কাভারেজ–এর লোভে ওনারা প্রথম আলো–র কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন।'

অন্য একটি ব্লগ প্ল্যাটফর্ম সচলায়তনে হিমু লেখেন ১৬ এপ্রিল, 'আরাধ্য যে তৃতীয় শক্তি নিয়ে অধ্যাপক ড. ইউনুসের নোবেলজয়ের পর দৈনিক প্রথম আলোর নেতৃত্বে আরও কিছু পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম নিরলস প্রচার চালিয়েছে, এ ধারণাটিকে 'খাওয়াতে' চেয়েছে মানুষকে, সেই তৃতীয় শক্তির কল্পিত ছবিটিকে মাড়িয়ে দলে মুচড়ে একাকার করে এক ভিন্ন তৃতীয় শক্তি শাহবাগে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এ যেন মঞ্চে বাঘের ছাল গায়ে অভিনেতার বদলে সুন্দরবনের বাঘেরই উপস্থিতি। অনভিজ্ঞের কাছে, ভুক্তভোগীর কাছে,

বহুলপ্রত্যাশীর কাছে, রূপমুগ্ধের কাছে বা ধান্দাবাজের কাছে বাঘছালে ঢাকা মানুষ আর আসল বাঘের মধ্যে পার্থক্য না–ও থাকতে পারে, কিন্তু সে বাঘ যার মুখোমুখি হবে, সে জানে, পার্থক্য কোথায়। তাই শাহবাগ নিয়ে মিডিয়ার উদ্বেগও যথেষ্ট স্পষ্টই ছিল। দৈনিক প্রথম আলো সহ কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল প্রথম কিছুদিন চেষ্টা করেছে, শাহবাগের বাঘটির মুখে নিজেদের কথা বায়ুস্বননের। মাহবুব রশীদ বা ফারুক গুয়েবাড়ার মতো উটকো লোকজনকে তাই আমরা শাহবাগের প্রতিনিধি হিসেবে পত্রিকা ও টিভিতে প্রলাপ বকতে দেখেছি। ... টিভিতে রাতের টক শো ও পত্রিকার উপসম্পাদকীয় পাতায় মিডিয়ার এই হালুমরূপী পোষ্য ম্যাওয়ের প্রাদুর্ভাব গত পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ বছর ধরেই দৃশ্যমান। ... সেখানে লিগভাবাপন্ন মাহমুদুর রহমান মান্না, বিএনপিভাবাপন্ন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বা জামাতভাবাপন্ন আসিফ নজরুল নয়নমনোহর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পাশাপাশি বসেন, নানা কথা বলেন। ...'

উপসংহার

বাংলাদেশে ব্লগার প্রজন্ম নিঃসন্দেহে সেখানকার শিক্ষিত সমাজ, এলিট সমাজের লোক। কিন্তু তার কোনো বাঁধন নেই। না রাজনীতির সাথে, না এনজিওর সাথে, না ধর্মের সাথে, না কর্পোরেটের সাথে, না মিডিয়ার সাথে। এই বাঁধনহীনতার কারণেই সে বিচ্ছিন্নও বটে। ঢাকার অদূরে সাভারে যখন ছশো শ্রমিক মারা যাওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, তখন প্রায় প্রতিটি ব্লগেই অসংখ্য শোক, রাগ, ক্ষোভ ফুটে বেরিয়েছে। ঠিক যেমন শাহবাগের আন্দোলনের পাশে নিরঙ্কুশ ভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্লগগুলি। ঠিক যেমন বাংলাদেশ সরকার এই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে একের পর এক ব্লগারকে আটক করলে তার বিরুদ্ধে কালা দিবস ও ব্লগ ধর্মঘট পালন করেছিল বেশির ভাগ ব্লগ ও ব্লগ প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু বিভিন্ন ব্লগারের লেখা পড়ে মনে হল, সাভার ঠিক কোথায়, কীভাবে সেখানে যেতে হয়, সে বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েছে এবং তার প্রকাশেও তারা কুণ্ঠাহীন। হ্যাঁ, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ যেমন তাদের আছে, তেমনই তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাও যে আছে সে বিষয়ে সে ওয়াকিবহাল এবং তা স্বীকারেও তার অস্বস্তি নেই। শাহবাগ আন্দোলনের শ্লোগান কন্যা, একটি বামপন্থী ছোটো ছাত্র সংগঠনের কর্মী লাকি আক্তার যখন এই এপ্রিলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেট দেয় গ্রাম মফস্বলে গিয়ে কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার ডাক দিয়ে, তা যে ব্লগার প্রজন্মকে খুব নাড়া দেয় তা বলা মুশকিল। এ একাধারে বিচ্ছিন্নতা, আবার যেহেতু এই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে ভেতরে কোনো খেদ নেই, তাই তা বাঁধনহীনতাও বটে। তাই, যে দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবনযাপন বেশ কঠিন কঠোর এবং যে দেশে বন্যা, খরা, সাইক্লোন বা কারখানা ধসে পড়ে/আগুন লেগে গণমৃত্যুর মতো ট্র্যাজেডি আকছার ঘটছে, সেই দেশেই ব্লগার প্রজন্ম এতটা স্বাধীন সৃষ্টিশীলতায় মগ্ন হতে পারে। এই স্বাধীনতা বা বাঁধনহীনতা কোনো খারাপ জিনিস নয় বলেই আমার মনে হয়। শাহবাগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা একে অনেকটাই জনমুখীও করেছে। সাভার ট্র্যাজেডির পর ব্লগার প্রজন্মের দল বেঁধে উদ্ধারকাজে নেমে যাওয়া, অনাথ হওয়া বাচ্চাদের ভরণপোষণ, আহতদের চিকিৎসা সহায়তা, পীড়িত শ্রমজীবীদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার বন্দোবস্তের মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। তবে বাংলাদেশের অগণিত শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষ কীভাবে এই প্রজন্মের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রাখবে তা কে জানে! এনজিও মার্কা ইউনিয়ন বা পার্টি দিয়ে যে তা হবে না তা নিঃসন্দেহ, কারণ এই প্রজন্ম বিন্দুমাত্র ধান্দাবাজি, যা ওই ধরনের সংগঠনগুলির বৈশিষ্ট্য, তাকে রেয়াত করবে না।

একটি শ্রমজীবী শিক্ষাভাবনা

কুন্দজিৎ মিত্র ও কৃশানু মিত্র

পুঁজিবাদ দ্বারা প্রোথিত স্বার্থান্বেষী অভিমুখ থেকে সরিয়ে সাম্যবাদ গড়ার আরও উদার প্রেক্ষিতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনুষ্য সমাজকে সমাজবাদের শিক্ষায় এই দীর্ঘ সময় ধরে পুনর্শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

কার্ল মার্ক্স

ব্যারি বুরক–এর মার্ক্সীয় শিক্ষাভাবনার বিশ্লেষণ

মার্ক্সীয় দর্শনের সারবত্তা থেকে বোঝা যায় যে চেতনা জীবনের মূল নয়, জীবন চেতনার মূলে। মানুষের চেতনা তার জাগতিক কার্যকলাপেরই ফলশ্রুতি, তেমনি মার্ক্সের লেখা থেকে এও সুস্পষ্ট, আমরা যে সংস্থান নির্মাণ করি, যে দর্শন মেনে চলি, যুগের চিন্তাধারা থেকে সমাজ, সংস্কৃতি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা সমাজের অর্থনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাজনীতি, আইন–ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে পরিবার এবং শিক্ষা শেষ অবধি সমাজের শ্রেণীবন্টনের ওপর নির্ভর করে, যা আবার সমাজের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তরে দাঁড়িয়ে সমাজ নামক যে মহাকাঠামো, তারই একটি অংশ শিক্ষাব্যবস্থা। সমাজের শ্রেণীকাঠামোর দাস সে। তার মানে এই নয় যে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ঘোর কোনো ষড়যন্ত্র 'শিক্ষাব্যবস্থা'। কিন্তু সমাজের গড্ডালিকা ও মানব–প্রবণতার চাপে, শ্রেণীবৈষম্যের অবয়বে পরিবর্তিত সে, সমাজে মানিয়ে চলার দৌড়ে।

মার্ক্স তাঁর 'জার্মান ইডিওলজি' গ্রন্থে বলেছেন, শাসকশ্রেণীই একটি সমাজের বস্তুগত ও বৌদ্ধিক চালিকাশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মত স্থান পায়, তাদের চিন্তাধারা স্বাভাবিকতার তকমা পায় আমাদের সমাজেও। আমরা দেখতে পাই, মানুষ জীবিকার সন্ধানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করছে আর শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রয়োজনমাফিক ছাত্রদের পরিবর্তিত করে চলেছে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারি আমলাদের হাতছানিতে শিক্ষা 'মানসিক বিকাশের রসদ' থেকে অর্থলাভের (সাফল্য) হাতিয়ার আজ। আর এভাবেই শিক্ষা গোলাম হয় যুগের জাঁতাকলে।

চিন্তাধার মত অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আন্তোনিও গ্রামশি এভাবে জ্ঞানের ওপর শাসকশ্রেণীর প্রভাবকে ইডিওলজিকাল হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যের তকমা দিয়েছেন। আর এই জ্ঞান লাভ করে ছাত্ররা রাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হয়। দার্শনিক লুইস আলথুসের তাই শিক্ষাকে মতাদর্শগত রাষ্ট্র-অংশবিশেষ (ইডিওলজিকাল স্টেট

অ্যাপারেটাস) বলেছেন। শিক্ষা তাই সামগ্রিক উন্নতির জন্য নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভ থাকে না। তা হয় শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞান যাকে সবাই সামগ্রিক উন্নতি বলে মেনে নেয়।

মহামতি পাওলোর উপলব্ধির কাছাকাছি

পাওলো ফ্রেইরির ভাষায় চালু শিক্ষাব্যবস্থা আদতে একটি ব্যাঙ্কিং প্র্যাকটিস। ছাত্র হল শূন্য অ্যাকাউন্ট আর শিক্ষক ডিপোজিটর। ডিপোজিটর মানে যিনি জমা করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জমা হল জ্ঞান, শূন্য ভাঁড়ারে। অর্থাৎ কিনা অবজ্ঞা করা হল ছাত্রের মেধাকে, শূন্য কলসি ভেবে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, শিক্ষক ছাত্রের আদানপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ তো চালু স্কুলে স্বাভাবিক ঘটনা। জ্ঞান থাকথাক করে ভরে দেওয়ার তো কিছু নেই। পাওলো এ সত্যকে স্বীকার করতেন শুধু একটা কিন্তু ওজর তুলে। এই কিন্তু, যাকে তিনি বলতেন আদানপ্রদানের ভেক। কারণ শিক্ষক তাঁর প্রশ্নের উত্তরটি নিজের মাথায় ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর প্রশ্ন যখন ছাত্রের মুখ থেকে উত্তর হয়ে ফিরে আসে, তখন তিনি তা মিলিয়ে নেন। যদি না মেলে আদানপ্রদান একমুখী হয়ে যায়। 'থ্রি ইডিয়েট্স' ছবিটির কথা ভাবা যাক, যেখানে প্রফেসর 'মেশিন কী' প্রশ্ন করলে র‍্যাঞ্চো-রূপী আমির প্রাঞ্জল ভাষায় উত্তর দেয়, যা সবার কাছে বোধগম্য হয়। শিক্ষক হজম করতে পারেন না সরল এই ব্যাখ্যা। আসলে স্কুল-কলেজে আমরা এই ছদ্ম বা সিউডো সংলাপ প্রত্যক্ষ করি। ছাত্রছাত্রী যারা এই একমুখী শিক্ষাভাণ্ডার জ্ঞাত করতে পারে তাদের আমরা শিক্ষিত বলি। বাকিরা প্রথমে ক্লাসছুট হয়, মানে ক্লাসে থেকেও অমনোযোগী পরে নৈঃশব্দের সংস্কৃতিতে হারিয়ে গিয়ে হয় স্কুলছুট। নিপীড়িত শ্রেণীর কিছু মানুষও ব্যতিক্রমী মেধার জোরে বা নিষ্ঠায় একমুখী জ্ঞান বস্তাবন্দি করে টিকে যায় এই ব্যবস্থায়। তারপর এলিটশ্রেণীর কক্ষপথে শিকড়হীন ভাসা। খুব নির্দিষ্ট করেই পাওলো দেখিয়েছেন শিক্ষকের এই প্রভুত্বব্যঞ্জক অথরিটিরিয়ান চলা আসলে রাষ্ট্রের ভাবরূপ। আর প্রভুত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা প্রতিষ্ঠা পেল তারা কেরানি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আমলা, রাষ্ট্রের পিলার বা স্তম্ভ। ফিরে আসা যাক ব্যারি বুরকের বিশ্লেষণে — জেনে বা না জেনে রাষ্ট্র দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা লালন করছে, যার গুণগান করছে, তা আসলে রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরির কারখানা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা — এডুকেশনিস্ট রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু চালু স্কুল বা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর অনাস্থা ছিল। তিনি প্রকৃতিপাঠে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতি মানে জল, জঙ্গল, আকাশ নিশ্চয় নয়। প্রাণহীন প্রকৃতি অবাস্তব, তাই প্রকৃতিপাঠে ডায়ালগ মানে কথোপকথনের নামান্তর। যে কারণে তিনি নাটক/নৃত্য/গীত এই মাধ্যমকে শিক্ষায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে যা পাওলোর সমদর্শন।

সময়ের উপলব্ধি

মাটিতে পা চালিয়ে চলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষকে সমস্যার মুখোমুখি ফেলে দেয়। যে সমস্যার গভীর অধ্যয়ন এবং সরাসরি মোকাবিলা করার সাহসী পদক্ষেপই পারে প্রয়োগে নতুন আলোর সন্ধান দিতে। সংগঠন হিসেবে 'বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ প্রকল্প' তার দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা ও প্রয়োগের বাস্তবতায় এই বিশ্বাসে উপনীত যে ক্লাসছুট, স্কুল-কলেজছুট সাধারণ, যারা নাকি রাষ্ট্রের গম্বুজ বা কাঠামোর অংশ নয়, শুধু ভোট দেওয়া নাগরিক, তারাই এর চলার সঙ্গী। অর্থাৎ এই যুবশক্তি যারা কোনোক্রমে পাওলোর ব্যাঙ্কিং ধারণা অনুযায়ী বস্তাবন্দি করেছে কিছু শেখানো বুলি আর তা উগড়ে দিয়ে ছোটোখাটো ডিগ্রি কোনোমতে জোগাড় করেছে বা করতে অক্ষম হয়েছে, তারাই আমাদের কমরেড। এদের মেধা আসলে কথা হারিয়ে থমকে গেছে। কারণ হাতেকলমে কাজে এদের মেধার বাস্তব প্রয়োগ শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছে। অসুবিধা শুধু কমিউনিকেশনে মানে কাগজে কালির ব্যবহারে। খোদ সরকারি তথ্যে উঠে এসেছে চালু শিক্ষার দুরবস্থার খবর। বাৎসরিক ASER জানান দিচ্ছে, ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলা পড়তে পারে না এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৩.২%। এটা আমাদের শিক্ষাবিদদের অনুভবের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। অথচ এই মানের ছেলেমেয়েরা অনায়াস দক্ষতায় টেকনিকাল যে কোনো কাজ করতে পারে। একটু পিছনে স্মৃতিকে ফেরালে দেখা যাবে, কীভাবে সামান্য এক ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি পার্সেল বোমা ডিজাইন করে তার টার্গেটকে হত্যা করেছিল। সে হয়তো কোনো স্কুলছুট মেধা, যাকে শত অপচয়ের শেষে মানুষ হিসেবে তখনই চেনা গেল, যখন তার মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটেছে অবহেলায়। এ তো গেল পিছনের সারির গল্প। সামনের সারির এগিয়ে থাকা 'ছাত্রদল' যারা জ্ঞানের, থুড়ি টাকার, ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য আকাশ/বাতাস/অমুক ফাইন্ডারের সমান্তরাল স্কুলে লাইন লাগাচ্ছে, তারা তো কবেই অস্মাজছুট হয়ে গেছে। তাই এদের মধ্যে থেকে সমাজমুখী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, থিঙ্কার এসে আমাদের রথের রশি ধরবে, এ চিন্তা অমূলক। আর ঠিক এই চিন্তনগত অবস্থান আমাদের বাধ্য করে নতুন শ্লোগান উচ্চারণে। 'আমাদের স্কুল আমরাই গড়ব', বা আর একটু এগিয়ে 'আমাদের মানুষ আমরাই গড়ব'। গ্রাম থেকে এসেছে জনমজুর/দিনমজুর পরিবারের স্কুলছুট/স্কুলপড়ুয়া ছাত্রের দল। আমাদের পথে — শূন্য থেকে শুরু করে তিনবছরে মাধ্যমিকের বুড়ি ছোঁয়া মানে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া তথাকথিত মেনস্ট্রিমের সাপেক্ষে। না হলে এরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। কুঁড়িসম ছাত্রছাত্রীরা শ্রীরামপুর বড়োবেলুর আবাসিক স্কুলে থাকছে, কলরোলে মেতে উঠছে চত্বর। সংগঠন এর পূর্ণ দায় বহন করছে।

একটি নমুনা ক্লাসের বিবরণী

সঞ্জিত বড়োবেলুতে থাকে। চিত্রশিল্পী হবে এই আশা ছিল মনে। অভাবের তাড়নায় মাধ্যমিকের গণ্ডি সে অতিক্রম করতে পারেনি। এখন সে শ্রমজীবী হাসপাতালের একজন সৈনিক। পয়লা মার্চ স্কুল শুরুর প্রথম দিন আমাদের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বললেন, ভালো ছবি আঁকতে পারে এমন কেউ আছে? সঞ্জিত হাজির, ব্ল্যাকবোর্ডে ভেসে উঠল অপূর্ব এক ছবি। শিক্ষকের কাছ থেক প্রশ্ন এল, এটা কীসের ছবি? প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে ছাত্ররা স্পিকটি নট। ছবির একটা অংশ দেখিয়ে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, এটা দেখে কিচ্ছু মনে হচ্ছে না? একজন বলল, স্যার যুদ্ধ হচ্ছে। আর কার কী মনে হচ্ছে? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না। কার কার যুদ্ধ মনে হচ্ছে হাত তোলো। তিনজন হাত তুলল। তাহলে বাকিদের কী মনে হচ্ছে? একটা উত্তর এল, স্যার প্রাঙ্গণ। শিক্ষক ভেবেছিলেন, ছবি অনুযায়ী দাঙ্গা শব্দটা আসতে পারে। পাওয়া গেল যুদ্ধ, প্রাঙ্গণ। এবার প্রশ্ন, যুদ্ধ বানান কী? সঠিক উত্তর এল। 'দ্ধ' দিয়ে আর কী কী শব্দ হয়? শুদ্ধ, মুগ্ধ, উত্তর এল। একজন বলল, মুগ্ধ তো গ আর ধ-এর যুক্তাক্ষর। ওরা নিজেরা বলল, প্রাঙ্গণ তো ঙ আর গ তাই না? ক্লাসটি বাংলা যুক্তাক্ষর শেখার পথ ধরল। স্যার বললেন, এই তিনটি যুক্তাক্ষর দিয়ে কতরকম শব্দ তৈরি হতে পারে খোঁজ করো। বাড়িতে, গাড়িতে, কাগজে, ঠোঙায় খুঁজে প্রায় ত্রিশটি শব্দ হাজির। যদি মনে হত ইতিহাস শিখব, তাহলে যুদ্ধ কার সঙ্গে কার, কখন — এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া যেত, উত্তর আসত বিভিন্ন। বিভিন্ন যুদ্ধের খোঁজ পেতে ইতিহাসের পাড়া বেরিয়ে আসা যেত। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা দিয়ে বেসিক অঙ্কের ক্লাস শুরু হতে পারত। ক্লাসে বসে পাওলোর ভাবনা মনে পড়তে থাকে। ক্লাসে প্রবলেম

ছুঁড়ে দাও। চলুক কাটাছেঁড়া। হাজারো উত্তর আসুক, জন্ম দিক নতুন প্রশ্নের। নতুন উত্তরের খোঁজে জন্ম দিক গতিমান আবহের। বিশ্চলমানতার নিরিখে মানুষের স্থানুবৎ 'আমি'র অস্তিত্ব ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক 'সম্মিলিত আমি'র কর্তৃত্ববাদ, চলুক ডায়ালগ।

মেমারিতে আলুচাষের অভিজ্ঞতা

বর্ধমানের বেনিগ্রাম, মেমারি ২নং অঞ্চলের তাপস কুমার ঘোষের নিজের অভিজ্ঞতার বয়ান। অনুলিখন : জিতেন নন্দী

আমি কালনা থেকে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে ১৯৮৫ সালে পাশ করেছি। হঠাৎ বাবা-মা একসঙ্গে মারা যাওয়াতে মাস্টার ডিগ্রি আর হয়নি। চোদ্দো বছর দাদার সঙ্গে চাষ করেছিলাম। দাদা, আমি আর আমার ভাই, যৌথ পরিবার ছিল। তারপর দাদা মারা গেলেন। এরপর যা হয় সংসারে, তিন ভাই আলাদা আলাদা। বাবার ত্রিশ-বত্রিশ বিঘা মতো জমি ছিল। সেটা তিন ভাগ হয়ে গেল। আমার দুই মেয়ে। তাদের পড়াশোনা শিখিয়ে বিয়ে-থা দিতে কিছু সম্পত্তি বেচতে হল। বিয়েতে ক্যাশ দিতে হয়নি। তবে খরচখরচা সোনা-টোনা তো দিতে হয়। আমার এখন পাঁচ বিঘায় চাষ।

ফলন বেড়েছে সামান্য, খরচ বেড়েছে অনেক

এবারে আমি সাড়ে তিন বিঘেতে আলু চাষ করেছি আর দশ কাঠায় সর্ষে দিয়েছি। বোরো চাষ করি না, ঠিকে-ভাগে দিই এক বিঘে। বর্ষার চাষ আমনটা করি। আমার বাঁধা লেবার আছে, তাদের পয়সা দিয়ে সারা বছর রাখতে হয়। এরা গ্রামের লোক। মজুরি ১৩০ টাকা, মানে দু-কেজি চাল আর ক্যাশ ৯০ টাকা। কাজ ম্যাক্সিমাম ছ-ঘণ্টা। আটটা থেকে লেবাররা কাজে লাগে, সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, তারপর খেতে যায়। রোয়ার সময় ছ-গণ্ডা বীজ ভেঙে পুঁতে দেবে, একটা লেবারের মজুরি হয়ে গেল। সে কাজটা করতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে।

অঘ্রাণ মাসের দশ তারিখ থেকে চারদিনে আলু (বীজ) লাগিয়েছি। এবারে একটু লেট হয়ে গেল। বৃষ্টি হয়ে গেল। মাটিটা হালকা করে দিয়ে চাপান-টাপান দিয়ে হাত-লাঙলে টানা দিয়ে দিচ্ছে। ফাল্গুন মাসের ২০-২২ তারিখের পর থেকে আলু তোলা হয়েছে। কাঁচা আলু আমাদের হয় না। আমাদের হয় জ্যোতি, চন্দ্রমুখী। কাঁচা আলু হয় এস-ওয়ান, পোখরাজ বীজে, ওটা অল্প সময়ের মধ্যে হয়। ওগুলো স্টোরে রাখা যায় না, পচে যাবে। কাঁচা আলু আমাদের এলাকায় হয় না। ওটা আছে কিছু কিছু মুন্সিডাঙা, আসাদপুর, শ্রীধরপুর, শঙ্করপুরে। মেমারিতে জ্যোতিটাই বেশি, চন্দ্রমুখী লোকে একটু-আধটু খাওয়ার মতো লাগায়।

আগে কী হয়েছে, যখন দাদার সঙ্গে চাষ করেছি, তখন চাষের খরচাটা কম ছিল। ফলন গড়পড়তা একই আছে। তখন ষাট কেজির বস্তা ছিল। বিঘেতে ৮৫-৯০-১০০ খানা (বস্তা) করে আলু হয়েছে। এখন পঞ্চাশ কেজির বস্তা। ১১০-১২০ খানা করে আলু হচ্ছে। ষাট কেজি থেকে পঞ্চাশ কেজির বস্তা হল কেন? স্টোরে তিনতলা-চারতলা মুটিয়াদের তুলতে হচ্ছিল। এদের অসুবিধার জন্য পঞ্চাশ কেজির বস্তা করা হল। তাছাড়া এতে ভাড়াটাও বেশি পেয়ে যাচ্ছে স্টোর-মালিকেরা। দশ কেজি করে কমে যাওয়াতে প্যাকেট (বস্তার সংখ্যা) বেড়ে গেল।

এখন যা অবস্থা, প্রত্যেক গ্রামেই ভাই ভাই আলাদা হয়ে গিয়ে এক-একটা পরিবারের জমি গড়ে ৫-৬ বিঘে হবে। গরিব মানুষদের ১০ কাঠা, ১ বিঘাও আছে। তারাও আলু চাষ করে। আলুর সময় কিছু কিছু জমি এখন ভাগে দিচ্ছে, খুব কম। গতবছর থেকে বোরো চাষে ঠিকে-ভাগে দিচ্ছে, বোরো চাষ খুব একটা লোকে করছে না। বিশেষ করে এই আলু বেল্টের চাষিরা। বাঁকানদীর ওপারের চাষিরা বোরোচাষ করে। ওদের জলের সুবিধা আছে আর আলুচাষটা কম হয়। মাটিটা এঁটেল তো।

মেমারিতে আলু চাষ করার মতো বড়ো চাষি পরিবার বেশিরভাগই ভাগ হয়ে গেছে। খুব বেশি হলে ২০-২২ বিঘা আছে। আলু চাষে কন্ট্রাক্ট প্রথা খুব কম, সেক্ষেত্রে বিঘে প্রতি ১৫ থেকে ২০ খানা (বস্তা) আলু দিতে হয়, তারপর সে চাষ করবে, লাভ করবে, যা করবে। একবার একজন অনেকটা চাষ করেছিল, চারদিকে চারখানা মিনি লাগিয়ে, তা একশো বিঘা হবে। লাভ করতে পারেনি, সব পচে গিয়েছিল, ওই ২০০৪ সালে।

চাষি যদি বাড়ির বীজ নিয়ে চাষ করে, আলুচাষের খরচ বিঘা প্রতি ১৮,০০০ টাকার কমে হবে না। আর যদি খাস বীজ (এবছর নতুন বীজ কিনে) নিয়ে করে ২০,০০০ টাকা খরচা হয়। আমার ভাইয়ের কথাটা জানি। ওতে ফলনটা একটু বেশি হয়। বিঘেতে ১০ থেকে ২০ খানা (বস্তা) আলু বেশি হয়। বাবার আমলে চাষ থেকে বাবা বাড়ি-টাড়ি করেছেন, মেয়েদের বিয়েও দিয়েছেন। কিছু জমিও কিনেছিলেন। ভাগাভাগির পর পনেরো বিঘে জমি ছিল আমার। এখন ওই খাওয়া-পরাটা চলছে। বাড়তি কিছু করতে গেলে এই জমি থেকে হবে না।

লেবার, একশো দিনের কাজ

বাইরে থেকে লেবার আগে আসত, এখন কম আসে। এখন একশো দিনের কাজ আছে। তখন ফাল্গুন মাসে লোকের হাতে কাজ থাকত না। পুরুলিয়া, নদিয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে ওরা নিজেরাই চলে এসে বাজারে বসে থাকত, সেখান থেকে লোকে ওদের নিয়ে যেত। যখন দাদা আর আমি একসঙ্গে চাষ করতাম, আমার বাড়িতেও বাইরের লেবার আসত। একবছর হয়তো এল, পরের বছর থেকে নিজেরাই আসতে থাকত। আসার জন্য বলতে হত না, ওরা ঠিক সময় মতো চলে আসত। এদের মধ্যে আদিবাসী আছে, পূর্ববঙ্গীয় আছে, মুসলিমও আছে। মহিলাও থাকত। আলুর সিজনে এখানে থাকার জন্য বাঁশ-খড় দিতে হয়। ওরা ঘর বানিয়ে নেয়। এখন আর খুব একটা আসে না। রেট একই, লোকাল লেবারদের মতোই। জ্বালনটা দিতে হত। গ্রামের দোকান থেকে মশলাপাতি-তেল-নুন কিনে ওরা রান্নাবান্না করে নিত। আলু তোলা শেষ হয়ে গেল। ওরা চলে যেত। আবার বোরো ধান কাটার সময় আসত। ধান কেটে তুলে ঝেড়ে দিয়ে চলে যেত। এখন গ্রামের লেবারদের দিয়েই আলু তোলা হচ্ছে। আমার কাজ হয়ে গেল, তারপর আর একজনের কাটল, এইভাবে চলে। যখন মাঠের কাজটা চলে তখন একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকে। পঞ্চায়েত থেকে প্ল্যানিং হচ্ছে, একশো দিনের কাজ তখনই করানো হবে, যখন চাষির কাজ নেই।

লেবারদের মজুরি আনুপাতিক হারে বেড়েছে। তাছাড়া রাজনীতির ব্যাপার আছে, দলের ব্যাপার আছে। গতবছর মজুরি ছিল ৮০ টাকা আর দু-কেজি চাল, এবছর দশ টাকা বেড়েছে। তার আগে ২০১১ সালে ছিল ৬৭ টাকা। এখন কোনো কোনো জায়গায় ১০০ টাকাও

আছে। আমাদের পাশের গ্রামে ১০০ টাকা। এখন আলুর সিজন থেকে তো লেবাররা একবেলা কাজ করছে, ১টার মধ্যেই কাজ শেষ। মানে পাঁচ ঘণ্টা কাজ।

একশো দিনের কাজের দারুণ প্রভাব পড়েছে লেবারদের ওপর। বছর তিনেক আগে রাধাকান্তপুর, মল্লিকাপুর ইত্যাদি জায়গায় শ্রমিকেরা মালিকদের বয়কট করেছে। চাষিরা নিজেরা চাষ করেছে। তারপর ঠেকায় পড়ে জনমজুররা আবার চাষিদের কাছে কাজ করতে আসছে।

আলুর দাম

আলু ওঠার পর বাজার স্টার্ট হল ২৫০ টাকা থেকে। তখন খদ্দের নেই খদ্দের নেই রব। তখন তো বিক্রিবাটা হয়নি। এবারে বাজার কেটে কেটে ২০০ টাকায় এল। প্রতিদিন ১০ টাকা ২০ টাকা করে রেট নামিয়ে দিয়েছে। এবারে বিক্রি শুরু হল। এইভাবে ১৬৫ টাকা পর্যন্ত বাজার নামিয়ে দিয়েছে। সরকার কেনার কথা ঘোষণা করার পর ওই ১৬৫ থেকে আবার ১৯০–২০০ টাকায় রেটটা উঠল। তার আগে তো বাইরে আলু যেতে দিচ্ছিল না। সরকার ঘোষণা করার পর বাজারটা চাঙ্গা হল। সরকার যদি বাইরে না যেতে দেয়, ব্যবসাদাররা তো নিয়ে যেতে পারবে না। সরকারকে ঘোষণা করে বর্ডার খুলতে হবে। ট্রেনে রেক পাচ্ছিল না বলে লোডিং হচ্ছিল না। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোল্ড স্টোরের মালিকদের একটা অশুভ আঁতাত হচ্ছিল। সেই ক্ষেত্রে সরকার ঘোষণা করাতে চাষির ভালো হয়েছে। সরকার প্রথমে কিছু করেনি। চাষি যখন কাঁদবে, তখনই তো সরকারের কানে যাবে! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, তারাও তো লোকালে আছে। তারা যখন চাষির কাছ থেকে অভিযোগটা পাচ্ছে, তখন তারা উর্ধতন নেতাদের কাছে জানাচ্ছে। এইভাবে সরকার সক্রিয় হল। চাষি কখনোই ১০০% সুবিধাটা পায় না। ঘোষণা করলেই যে বাজারে দামটা সবসময় বাড়ে তা বলা যায় না। আলুর ফাটকা, সেটা মহাজনদের ওপর নির্ভর করে। ধানটা তবু কিছুটা বলা যায়, এবারে এই দামটা পাওয়া যেতে পারে। আলুর ব্যাপারটা নিশ্চিত নয়।

আলু মাঠ থেকেই বিক্রি হয়ে যায়। খাওয়ার জন্য ঘরে কিছু রাখা হয়। বেশি রাখতে গেলে পচে যাবে। আর মাঠ থেকে ঘরে নিয়ে আসাও একটা ঝামেলা। জমি থেকে মাথায় করে করে বয়ে আনা, অনেক লেবার লেগে যায়। এক বিঘেতে দশ–বারোটা লেবার লাগবে, মানে বাড়তি ১৩০০ টাকা খরচ। জমি থেকে বাড়ি, গড়পড়তা হাফ কিলোমিটার রাস্তা। বাড়িতে সেরকম কেউ রাখে না, তাতে অসুবিধা হয়। পচবে, তার ওপর পরবর্তীকালে দাম পাব কিনা নিশ্চয়তা নেই। ডাইরেক্ট কোল্ড স্টোরেজেও আমরা রাখতে পারি না। চাষের খরচ মেটাতে দাদন নিতে হয়েছে, সমবায়ের কাছ থেকে লোন নিয়েছি। ৩১ মার্চের মধ্যে সেটা না মেটালে পরের লোন দেবে না। ওভারডিউ হয়ে যাবে, পুরোনো লোনের ওপর ২% ইন্টারেস্ট বেড়ে যাবে। জমিটা তো মর্টগেজ দেওয়া আছে।

কোল্ড স্টোরে আলু

যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, ক্যাশ পয়সা আছে, তার আলুটা রাখার ক্ষমতা আছে। সে কোল্ড স্টোরে যায়। তাতে তার কোনো কোনো বছর লাভ হয়, আবার কোনো কোনো বছর লোকসানও হয়। আমি ২০০৪ সালে লাস্ট স্টোরে আলু রেখেছিলাম। তারপর থেকে আর রাখি না। তার আগে দাদা রাখত, আমিও চোদ্দো বছর দাদার সঙ্গে ব্যবসা করেছি। লাইন–টাইন সবই জানা ছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে আমার বিরাট লোকসান হল। ৭ টাকা বস্তা আলু বিক্রি করতে হল। মালটা স্ট্যাক হয়ে গিয়েছিল। বাইরের পার্টিরা নিচ্ছিল না। ২৫ প্যাকেট আলুর বন্ড এখনও রেখে দিয়েছি। বেচিনি, নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। তখন মাঠে আলু বেচতাম না। মাঠ থেকে আলু তুলে গাদা করে দেওয়া হল। মুটে এসে বস্তায় পুরে নিয়ে মাঠেই কাঁটা হয়ে যেত। ট্রাক্টরে লোড করে স্টোরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্টোরের ভাড়া গতবছরে ছিল ৫৬ টাকা, এবছরে ৬০ টাকা। নভেম্বর অবধি ডেট দেওয়া থাকে। তার মধ্যে বের করে নিতে হবে। ১৫ দিন এক্সটেন্ড করে, তার জন্য একস্ট্রা চার্জ করে।

চাষি বলতে তো একটা সম্প্রদায় বোঝায়। আমার বাড়ির কথাই ধরুন, চাষ আছে আবার একটা চাকরি আছে, বাড়ির একটা ছেলে চাকরি করে। আমি একরকম চাষি। আবার একজন, তার চাষ আছে আবার একটা ভালো ব্যবসা আছে। সে আরেক রকমের চাষি। আবার একজনের চাষ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। সে অন্য ধরনের চাষি। এই যে, যার বাড়িতে চাকরি আছে বা ব্যবসা আছে, তার কাছে টাকা আছে, সে স্টোরে আলু রাখতেই পারে। ১০% যদিও বেচে, ৯০% চাষিই স্টোরে আলুটা রাখে। আর যে শুধু চাষের ওপরই নির্ভর করে, মিনিতে জল নিয়েছে, ট্রাক্টর নিয়েছে, এই চৈত্র মাসে সব পেমেন্ট করতে হবে তাকে, লেবার যারা আলু তুলেছে, তাদের পেমেন্ট করতে হবে। এইভাবে তো লোকে বাঁধা থাকে। ধারবাকি সারা বছরই চলে, টুকটাক হয়তো দিল, চৈত্র মাসে পুরো পেমেন্ট করতে হবে। তারপর সমবায় আছে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৯০% চাষিকেই বেচে দিতে হয়, ১০% রাখতে পারে।

কৃষি সমবায়

কৃষি সমবায় যদি না থাকত, তাহলে চাষিদের মহাজনের কবলে পড়তেই হত, দাদনটাও বেশি লাগত। সে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। কৃষি সমবায় থাকাতে চাষির অনেক বেশি সহায়তা হয়েছে। এখানে সব গ্রামে সমবায় রয়েছে। আমাদের অষ্টগ্রাম সমবায়ে আমি বোর্ড পরিচালনা করেছি বারো বছর, পদে ছিলাম চার বছর। ক্যাশিয়ারের কাজও করেছি কিছুদিন। ১৯৬৫–৬৬ সালে এই সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার বিশাল ইতিহাস আছে। তারপরে একসময় সমবায়টা শোষকের পর্যায়ে পড়ে গেল। যারা বোর্ড পরিচালনা করেছে, তারা ... লোন নিয়ে বাইরে টাকা খাটানো ... সেটা প্রচ্ছন্ন, বাইরের লোক তো বুঝতে পারবে না। আমি বোর্ড পরিচালনায় ছিলাম বলে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। কোনোদিন কেউ ধরতেও পারবে না। আমি যদি এসব নিয়ে বলি, আমি তো প্রমাণ করতে পারব না। তখন সমবায়ে পার্টি–ফার্টি অত ছিল না। এখন হচ্ছে। সমবায়ে দলের সিম্বল নিয়ে কেউ কিছু করে না। তবে সবাই জানে ও তৃণমূলের, ও সিপিএমের ইত্যাদি।

আমি যখন সমবায়ে ছিলাম, তখন দেখেছি, চাষিকে একগাড়ি চাপান (সার) কিনতে গিয়ে লোন করতে হয়েছে। তার জন্য বর্ধমান সেন্ট্রাল কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। চাষিরা বুঝতে পারছে, সমবায় না থাকলে তো আমরাই অসুবিধায় পড়ে যাব। যারা সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিচ্ছে।

একটা রাইস মিলের তুলনায় একটা কোল্ড স্টোর মানে বিশাল ইনভেস্টমেন্ট, পাঁচগুণ হবে। আগে এটা মারোয়াড়িদের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এখন আমাদের বাঙালিরা করছে। লোকালে একটাই শুধু সমবায় ভিত্তিক কোল্ড স্টোর আছে, শ্রীধরপুর কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কের। বাকি সব লোকাল লোকেদের। শ্রীধরপুর কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সুবিধা কি আছে, ওদের এলাকার যারা চাষি, ওদের সদস্য, তাদের আলু ওরা নেবেই। তাদের ওরা ফেরাবে না। তারপর যতটা

খালি থাকে, বাইরের চাষির জন্য। বিক্রিবাটা, টাকাপয়সার ব্যাপারেও ওদের বিশাল ব্যাপার। শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সমবায়টা যখন উঠেছিল, অন্যরা ততটা উঠতে পারেনি। সততার ব্যাপারটা থাকে। মেরেধরে তো হবে না। এলাকার চাষিদের সহযোগিতা পেয়েছে। ওদের ধান উঠলেই ওজন করে সমবায়ের কাছে দিয়ে যাও। সেই ধানের হায়েস্ট বাজারদর ওরা দেবে। এগুলো চাষিরা পেয়েছে। আমাদের এশিয়ার মধ্যে দু-তিনবার রেটিং হয়েছিল, তার মধ্যে কোনোবার ফার্স্ট, কোনোবার থার্ড হয়েছে এই কো-অপারেটিভ। ওদের রেজিস্টার্ড নাম শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। কোনো কো-অপারেটিভের নাম ব্যাঙ্ক হয় না। যখন পশ্চিমবঙ্গের কো-অপারেটিভ আইন হয়নি তখন থেকেই এটা ওই ব্যাঙ্ক নামে চলছে। ওরা রাইস মিল করেছিল, ম্যানেজার চুরিচামারি করেছে, ওরা বিক্রি করে দিয়েছে। ওদের কিছু সেক্টর লসে চলে। কিন্তু মোটের ওপর ইনকাম আছে বলে চলে যাচ্ছে। গ্রামের ভিতর কয়লার আড়ত আছে, মুদিখানা আছে। কোল্ড স্টোর থেকে ওদের বিশাল ইনকাম। আজ থেকে বিশ বছর আগে একটা সময় ছিল, যখন সমবায় ভিত্তিক কোল্ড স্টোর বানানো কোনো বিশাল ব্যাপার ছিল না। সরকার তো লোন দিয়েছে। তখন যারা পেরেছে হয়েছে, এখন আর পারবে না। এক লাখ বস্তার ক্যাপাসিটি মানে মিনি স্টোর। সেখানে গুড়, সবজি এসব রাখে। ৩ থেকে ৫ লাখ বস্তা আলুর জায়গা রাখতে হবে স্টোরে। গড়ে ৩ বস্তা আলু থাকে একটা স্টোরে। সেটা বিশাল ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার।

আলু ব্যবসায়ী

দুবার পেপসি কোম্পানি এসেছিল এখানে। কিন্তু ওদের যা শর্ত, বীজ ওষুধ সবকিছু মাল ওদের কাছ থেকে নিতে হবে, বিশাল দাম সব, আলুটা ওদের কাছে ওদের স্থির করা দামে দিতে হবে। গতবছরে খোলাবাজারে আলুর বিশাল দাম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা ১৭০-১৮০ টাকার মতো দাম স্থির করেছিল, পুরোটাই ওদের দিতে হবে। ওদের ওষুধের সাংঘাতিক দাম। খরচা বেশি পড়ে যাচ্ছে, চাষির লোকসান।

লোকাল ব্যবসায়ীরা আলুটা নিয়ে বড়ো ব্যবসায়ীদের দেয়। যেমন, মেমারিতে আছেন নারায়ণ কুণ্ডু। তারা সেই আলু পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো প্রান্তে পাঠাবে কিংবা রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। আমাদের লোকালে কিছু ধনী ব্যবসায়ী আছে, তারা ২০-৫০টা ছোটো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করে নেয়। দু-গাড়ি চার-গাড়ি আলু লোড করে তারা বাইরে পাঠিয়ে দেয়।

আলু হচ্ছে গোল

একজন চাষি, ধরুন আমার কথাই বলছি। ধরা যাক, আমার ৫০,০০০ টাকা লোন আছে। সমবায়ের কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা নিয়ে চাষ করেছি। তারপর আমার ফল্ট (ফলন আশানুরূপ হল না এবং দাম পাওয়া গেল না কিংবা এর যে কোনো একটা ঘটল) হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে তো সমবায়ের লোনটা মেকআপ করতে হবে। সমবায় বলল, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, আলুটাকে লোড করে দিয়ে বন্ডগুলো অ্যাডজাস্ট করে নাও। এইভাবে চাষির ঋণ শোধ হল। এবার চাষি বলল, তাহলে আমি তো কিছু পেলাম না। তখন ৫০,০০০ টাকার জায়গায় তার লোনটাকে এবার ৭০,০০০ টাকা করে দেওয়া হল। তাহলে সেই চাষিটা তো আরও জড়িয়ে গেল। ওই আলুটা সে বন্ডে ঢুকিয়ে দিল এবং তারপর আবার সে পরের চাষে হয়তো ফল্ট করে গেল। সে ৭০,০০০ টাকা নিয়েছে আর তাকে তো আগের আলুর বন্ডটা ছাড়াতে হবে। বন্ডটা দিতে হয় সমবায়কে, সমবায় দেয় বর্ধমানের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে, সে টাকাটা স্যাংশন করে।

আমরা দেখেছি, ২০০৪ সালের ঘটনা। ওই যে ৫০,০০০ টাকার লোন শোধ করতে না পেরে চাষি বন্ডে অ্যাডজাস্ট করেছে, এবারে যে পরিমাণ আলু সে অ্যাডজাস্ট করেছিল, সেই পরিমাণ আলু বিক্রি করেও ৫০,০০০ টাকা হচ্ছে না। তার মানে, তার ওই ৫০,০০০ টাকা পুরো শোধ হচ্ছে না। ধরা যাক, ১০,০০০ টাকা রয়ে গেল। তাহলে আবার সে মোট ৮০,০০০ টাকার লোনে পড়ে গেল। ২০০৪ সালে বহু চাষি এইভাবে মার খেয়েছে। পরে সরকার ছাড় (সাবসিডি) দিল বলে সে বেঁচে গেল। কিছু ছাড়, প্রথম যেটা সরকার দিয়েছিল, সেটা বড়ো বড়ো চাষিরা পেয়েছিল। তাদের পাওয়া উচিত ছিল না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাষির ঋণ মকুব করে দিয়েছিল। বর্ধমান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেল, চাষির কাছ থেকে আর ঋণের টাকাটা চাইল না। তাতে করে কিছু সম্পন্ন চাষি লাভ পেল। তারা ট্রাক্টর নিয়েছিল লোনে। সেটা মকুব হয়ে গেল। এজেন্ট মারফত তারা আবার আর একটা ট্রাক্টর নিয়ে নিল। কিন্তু বহু মাঝারি বা ছোটো চাষি, আমাদের অষ্টগ্রামের কথাই বলছি, তারা সম্মানের জন্য কষ্ট করে বছর বছর সমবায়ের টাকা শোধ করে গেছে, তারা এর কোনো বেনিফিটই পেল না। সরকারের ঋণ মকুবের ফলে ছোটো চাষির খুব লাভ হয়নি।

এই অবস্থায় আলু চাষ বাড়া তো উচিত নয়, তবু কেন বেড়েছে? মেমারিতে ১৫% মতো বেড়েছে। সাধারণ চাষি যারা চাষ করে খায়, তারা কিন্তু বাড়ায়নি। কী করে বাড়াবে? ১৮,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা ইনভেস্ট করতে হয়, তাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়। যাদের বাড়িতে একটা-দুটো চাকরি আছে কিংবা ব্যবসা আছে আর জমি আছে অনেক, তারা বাড়িয়েছে। তাদের নিজস্ব গাড়ি (ট্রাক্টর) আছে, নিজস্ব মিনি আছে। বহু জায়গায় জলের অভাবে বোরো চাষ হয়নি। সেই জমিতেও আলু লাগিয়েছে। নিজের জমিতে বাড়িয়েছে বা পাশাপাশি কিছু জমি নিয়ে নিয়েছে। আলুচাষের খরচাটা বার করা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেছে। বাড়িতে যদি একটা স্কুলমাস্টার থাকে, তাহলে আলু লাগিয়ে সুখ!

দাদার কাছ থেকে বা বড়োদের কাছ থেকে যে ধারণাটা পেয়েছি, তারা বলেছে, আলু সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা পাবি না। এবছর দাম পড়ে গেল মানে যে সামনের বছর দাম উঠবে না, তা নয়। আবার এবছর দাম উঠলে সামনের বছর মার খাবে না, তাও বলা যায় না। একটা প্রবাদ আছে এখানে, আলু হচ্ছে গোল, একবছর তার চোখ ওপরে পড়বে, আর বছর নিচে। চোখ তুলে কখন তাকাবে বলা যায় না। আলু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা খুব কঠিন।

চিঠিপত্র

বিষয় : সম্পাদকীয়

১

প্রিয় সম্পাদক

আপনাদের পত্রিকার শেষ সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৩) হাতে এসেছে। সম্পাদকীয়টি অসাধারণ হয়েছে। শাহবাগ আন্দোলনের প্রসঙ্গে যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা এবং মুসলিম মৌলবাদের প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছেন, তা এককথায় অনন্য সাধারণ। শাহবাগ সংক্রান্ত যে আলাপটি প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়ে মনে জোর পেলাম। তবে বর্তমান চিঠির মুখ্য বিষয় সম্পাদকীয়।

এশিয়া মহাদেশের ভারত–পাকিস্তান–বাংলাদেশ এই তিন দেশে মৌলবাদ খুবই শক্তিশালী। এর কারণ সমাজের থিওক্র্যাটিক চরিত্র। আর রাজনীতির key concept যেহেতু ক্ষমতা, তাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সহজেই বৈধ হয়ে ওঠে। ধর্ম যে ইনগ্রুপ সেন্টিমেন্টের জন্ম দেয় তাকে ব্যবহার করে রাজনীতি তার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেতে চায়।

সম্পাদকের দুটি পর্যবেক্ষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

১. শাহবাগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, 'কলম' পত্রিকার বিক্রির বাজার সম্প্রসারণ; এবং

২. 'জামাত–ই ইসলামি এক সচেতন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ... ক্ষমতার রাজনীতি সাম্প্রদায়িক এই অর্থেই যে, তা সবসময় ক্ষমতা অর্জনের জন্য নানারকম ভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কেপরোয়াভাবে আপোস করতে থাকে। এমনকী, পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার সঙ্গেও, যেমন পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গেও। সেটা যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে দাঙ্গার চেহারা নেয়, তখন ওই ক্ষমতার প্রতিনিধিরাই দাঙ্গা থামাতে যায়। এই চক্রে সমাজ আর কতদিন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে?'

প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান সংখ্যাতেই কৌশিক চক্রবর্তী এ প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উত্তরে রয়েছে ইতিহাসের প্রত্যাবর্তনের কথা। অর্থাৎ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্ত্বার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা ১৯৭২–এর সংবিধানের প্রত্যাবর্তন। এই সংবিধানের 'প্রধান স্তম্ভ ছিল চারটি — গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারকে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকে, কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করে। এমনকী এই সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রশ্নেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।' (কৌশিক চক্রবর্তী, পৃ. ২৬)। কৌশিক সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন, ১৯৭২–এর পর এপর্যন্ত বাংলাদেশের যে ইতিহাস তা আসলে শাসকপ্রভু কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতাকে লালনপালন করার ইতিহাস। এবং সমাধান হিসেবে ১৯৭২–এর সংবিধানের প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন।

সম্পাদকীয়তে উত্থাপিত প্রশ্নের যে উত্তর কৌশিকের লেখায় পাই, সেখানে অনুক্ত থেকে গেছে সংগ্রামের কথা। কারণ ১৯৭২ সালের সংবিধান আসলে একটি সংগ্রামের ফল। সেই সংগ্রামের কতগুলি সীমাবদ্ধতা ছিল। ফলে সংবিধানটিও বেশ কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে সংবিধানে কেবল কতগুলি ভালো কথা থাকলেই হয় না। সেগুলির যথাযথ প্রয়োগযোগ্যতাও থাকা দরকার। ভারতীয় সংবিধানের মতো বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় secular শব্দটি থাকলেও, ২৫নং ধারায় বিশ্বাসের অধিকার স্বীকৃত হলেও, এখানে সংখ্যালঘুর ওপর নিপীড়নের মাত্রা কিছু কম নয়। ভাগলপুর, বোম্বে, গুজরাত এবং সাম্প্রতিককালে আসামে সংখ্যালঘুর ওপর ভয়াবহ অত্যাচার ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ২৫নং ধারাকে ব্যঙ্গ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কারণ ওখানে রয়েছে বিজেপি, আরএসএস, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ইত্যাদির সমগোত্রীয় বিএনপি, জামাত–ই ইসলামি। এদের হাতেই নিহত হচ্ছে আমাদের আত্মীয়স্বজন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন প্রিয়জন।

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর থেকে একটা বার্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তা হল, secular অলঙ্কারটিকে সংবিধানের অঙ্গে কেবল জড়ালেই হবে না, প্রয়োজন তার প্রয়োগ এবং প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের। সংগঠিত ধর্মের ভয়াবহ রূপ আমরা বারবার দেখেছি। আর তাই এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া ও সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। শাহবাগ এটাই করেছে। শাহবাগ আন্দোলন যে সেকুলার পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরছে তা যে কেবল এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে সদর্থক তা নয়, সমগ্র পৃথিবীর দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আরও যে বিষয় উল্লেখ করা দরকার তা হল, ভারতের প্রগতিশীল মানুষেরা সাধারণত হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, মুসলিম মৌলবাদ সেখানে অনুক্ত থেকে যায়। শাহবাগের আন্দোলন মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে; সমস্ত রকমের মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গুজরাত ও আসামে মুসলিম জনতার ওপর অত্যাচারকে কেন্দ্র করে মুসলিম মৌলবাদীরা যেমন ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেছে, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন ও শাহবাগকে সামনে রেখে হিন্দু মৌলবাদীরা একই কাজ করার চেষ্টা করছে। আমরা সমস্ত ধরনের মৌলবাদের বিরুদ্ধে। উভয় ধরনের মৌলবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে, তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এ কাজে শাহবাগের দৃষ্টান্ত আমাদের সাহায্য করতে পারে।

পরিশেষে বলি, শাহবাগ আন্দোলন, মুসলিম মৌলবাদ, আসামে মুসলিম নিধন ও বাংলাদেশে হিন্দু নিধন ইত্যাদি প্রশ্নগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ যদি নেন তাহলে ভালো হয়।

মন্থন সাময়িকীর প্রসার, প্রচার ও সাফল্য কামনা করি।

৩০ এপ্রিল ২০১৩ কণিষ্ক

২

সম্পাদক, মন্থন

জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১৩, চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রথম পাতায় 'সম্পাদকীয়' এক বলিষ্ঠ নির্ভীক সাংবাদিকতার সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। বহুল প্রচারিত এবং বিজ্ঞাপিত বহু কাগজে যে খবর প্রকাশিত হয় না, মানুষের মননকে জাগ্রত করতে, সজাগ করতে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ ভালোবাসার দ্বারা সমাজের দায়বদ্ধতা পালন করতে মন্থন সে কাজটা করেছে এবং করে যাচ্ছে। মেটিয়াব্রুজ এক ঐতিহাসিক স্থান, তার অদূরে বদরতলা ও বটতলা একই সূত্রে বাঁধা। হিন্দু–মুসলমান বহুযুগ ধরে পাশাপাশি এক নিবিড় বন্ধনের মধ্যে একে অপরের পড়শি হয়ে বসবাস করে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে পারস্পরিক সুখ–দুঃখের অংশীদার হয়েছে। কিন্তু আজ কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে যা চিন্তার বিষয়।

'একবছর আগে একটা সরকারি নির্দেশ এসেছিল, পাবলিক লাইব্রেরিতে নির্দিষ্ট ১৩টি সংবাদপত্রের মধ্যে থেকেই কেবল সংবাদপত্র কেনা যাবে। এর মধ্যে ছিল দৈনিক স্টেটসম্যান, সংবাদ প্রতিদিন এবং কলম। ... মেটিয়াব্রুজে কলমের দৈনিক বিক্রি এখন আনুমানিক পাঁচ হাজার। ... কলম একটা পত্রিকা, নতুন দৈনিক। শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং জামাত–ই–ইসলামির পক্ষে খোলাখুলি দাঁড়িয়েছে এই পত্রিকা।' এটা ঠিক নয়। এ বিষয়ে সকলকে আলো দেখিয়েছে মন্থন সাময়িকী,

আমাদের মিলনের সেতুতে যাতে ঘুণ না ধরে সে বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেছে এই সম্পাদকীয়। আমি তাঁকে ও তাঁর পত্রিকাকে অভিনন্দন জানাই, সেই সঙ্গে জনগণকে এই পত্রিকার সাধু প্রচেষ্টার পাশে থাকার আহ্বান জানাই।

২৮ মার্চ ২০১৩

কাশীনাথ ঘোষ
গার্ডেনরীচ, কলকাতা ২৪

ভ্রম সংশোধন

মন্থন সাময়িকী (জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১৩)–তে প্রকাশিত 'ফাঁসি ও ফাঁসির দাবি' লেখাতে আমার বেখেয়ালে একটা তথ্যগত ভুল থেকে গেছে। দুঃখিত। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আক্রান্ত মেয়েটির স্কুলের নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন না। ওই মেয়েটি যে–আবাসনে থাকত, উনি ছিলেন সেই আবাসনের নিরাপত্তা কর্মী।

৯ এপ্রিল ২০১৩

সৌরীন ভট্টাচার্য

Regn. No. WBBEN/2000/3047

মন্থন সাময়িকী : ২০১২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব

সংখ্যা/মাস	মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা	প্রতি কপির দাম (টাকা)	মোট কত কপি ছাপা হয়েছে	বিতরণ (কত কপি, কীভাবে)									
				গ্রাহক	সৌজন্য	নগদে বিক্রি (কপি)	আয় (টাকা)	স্টলে বিক্রি (কপি)	৩০% ছাড়ে আয় (টাকা)				
প্রথম জানু-ফেব্রু	২৪	৬.০০	৫৬২	২০০	২৪	১৬১	৯৬৬.০০	১০০	৪২০.০০	৭৭	১৩৮৬.০০	—	১৩৮৬.০০
দ্বিতীয় মার্চ-এপ্রিল	২৮	৬.০০	৫৪০	২০০	২৭	১২৬	৭৫৬.০০	৯৫	৩৯৯.০০	৯২	১১৫৫.০০	—	১১৫৫.০০
তৃতীয় মে-জুন	২৪	৬.০০	৫৪৮	২০০	৩১	১০৭	৬৪২.০০	৯৮	৪১২.০০	১১২	১০৫৪.০০	—	১০৫৪.০০
চতুর্থ জুলাই-আগস্ট	৩২	১০.০০	৬৩১	২০০	৩২	২৫২	২৫২০.০০	১২৫	৮৭৫.০০	২২	৩৩৯৫.০০	—	৩৩৯৫.০০
পঞ্চম সেপ্টে-অক্টো	২৮	৬.০০	৫৬৭	২০০	২৬	১৬০	৯৬০.০০	১০৬	৪৪৫.০০	৭৫	১৪০৫.০০	—	১৪০৫.০০
ষষ্ঠ নভে-ডিসে	২৪	৬.০০	৬৪১	২০০	২৬	১৩০	৭৮০.০০	১০৪	৪৩৭.০০	১৮১	১২১৭.০০	—	১২১৭.০০
পুস্তিকা													
কুদানকুলাম	১৬	৫.০০	১০০০	—	২২	৬০৭	৩০৩৫.০০	২৫০	৮৭৫.০০	১৪১	৩৯১০.০০	—	৩৯১০.০০
ফুকুশিমা	১৬	৫.০০	১০০০	—	২২	৫৭১	২৮৫৫.০০	২৪০	৮৪০.০০	১৬৭	৩৬৯৫.০০	—	৩৬৯৫.০০
মোট							১২৫১৪.০০		৪৭০৩.০০		১৭২১৭.০০		১৭২১৭.০০

সারা বছরের মোট আয় : ডাক গ্রাহক ৯০০০.০০, সরাসরি গ্রাহক ৮০০.০০, স্টলে বিক্রি বাবদ ৪৭০৩.০০, নগদে বিক্রি বাবদ ১২,৫১৪.০০, বিজ্ঞাপন ও অনুদান ছিল না; মোট আয় : ২৭,০১৭.০০ টাকা।

সংখ্যা/মাস	কত কপি ছাপা হয়েছে	পৃষ্ঠা সংখ্যা	ডিটিপি খরচ (টাকা)	ছাপার খরচ (টাকা)	কাগজের খরচ					
					নিউজপ্রিন্ট (টাকা)	মলাট বাবদ (টাকা)				
প্রথম জানু-ফেব্রু	৫৬২	৩২	১১২০.০০	১০০০.০০	৭৮০.০০	৪৫০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩৯৬৫.০০
দ্বিতীয় মার্চ-এপ্রিল	৫৪০	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৬০৫.০০	৪২০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩২৩০.০০
তৃতীয় মে-জুন	৫৪৮	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৫৬২.০০	৩৭৪.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩১৪১.০০
চতুর্থ জুলাই-আগস্ট	৬৩১	৩২	১১২০.০০	১০০০.০০	৮১৪.০০	৪৭১.০০	৩০০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৪০২৫.০০
পঞ্চম সেপ্টে-অক্টো	৫৬৭	২৮	১০৫০.০০	৯৬৫.০০	৭৭৭.০০	৩৮৪.০০	৩৫০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৩৭৯৬.০০
ষষ্ঠ নভে-ডিসে	৬৪১	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৬৪৫.০০	৪৫০.০০	৩০০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৩৩০৫.০০
পুস্তিকা										
কুদানকুলাম	১০০০	১৬	২৮০.০০	৫২৫.০০	১১২৫.০০	৫৫০.০০	৩০০.০০	৪৫.০০	—	২৮২৫.০০
ফুকুশিমা	১০০০	১৬	২৮০.০০	৫২৫.০০	১১২০.০০	৫৫০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	—	২৭৯০.০০
মোট ব্যয়										২৭,৫৭১.০০

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com; দূরভাষ : 2491-3666